জামায়াতে ইসলামীর

উদ্দেশ্য ইতিহাস কর্মসূচী

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

জামায়াতে ইসলামীর
উদ্দেশ্য
ইতিহাস
কর্মসূচী

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

শপ্র: ৩০

জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ইতিহাস কর্মসূচী

جماعت اسلامی کا مقصد تاریخ اور لائحہ عمل

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ

আবদুস শহীদ নাসিম

ISBN 984-645-009-5

প্রকাশক

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ ওয়্যারলেস রেলগেইট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩১১২৯২

পয়লা সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৯১

তৃতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০৩

শব্দ বিন্যাস

এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/এ-২ বড় মগবাজার ওয়েলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৯৩৪২২৪৯

মুদ্রণে

আল্ ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

নির্ধারিত দাম : ২০.০০ টাকা মাত্র

শতাব্দী প্রকাশনী

Jamaat-e-IslamirUddeshaya Etihash Karmashusi by Sayyed Abul A'la Maudoodi, translated by Addus Shaheed Naseem Published by Shotabdi Prokashani, Sponsored by Sayyed Abul A'la Maudoodi Research Academy, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone : 8311292, Ist Edition : September 1991, 3rd Print : April 2003, **Fixed Price : Tk. 20.00 Only.**

ভূমিকা

যে আন্দোলনের জন্যে জামায়াতে ইসলামীর সৃষ্টি হয়েছে, বিগত আঠারো বছরে তার দুইটি অধ্যায় শেষ হয়েছে। এখন তৃতীয় অধ্যায়ের সূচনাকাল। প্রথম অধ্যায়টি ছিল নিরেট পর্যালোচনা, সংগঠন নির্মাণ এবং দাওয়াত ও তাবলীগের। এর ধারাবাহিকতা ক্রমাগতভাবে নয় বছর চলে। দ্বিতীয় অধ্যায় ছিল সংগঠন ও প্রশিক্ষণের। এ অধ্যায়ের সময়কাল প্রায় ছয় বছর। বিগত তিন বছর থেকে শুরু হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়। এ অধ্যায় হচ্ছে, সার্বিক কার্যক্রমের প্রসার ও বাস্তব পদক্ষেপের। এ অধ্যায়ে সাধারণ মানুষ জামায়াতের সাথে পরিচিত হচ্ছে। তারা জামায়াতকে জানতে চাচ্ছে। জানতে চাচ্ছে, কি উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জামায়াত? জামায়াতের সাংগঠনিক কাঠামো কেমন? এযাবত সে কিভাবে কতোটুকু কাজ করেছে? আর ভবিষ্যতেই বা কি করতে চায়? তাছাড়া যে সমস্ত লোক এখন এই জামায়াতে প্রবেশ করছে তাদেরও একথা জানা এবং বুঝার প্রয়োজন আছে যে, তারা যে দলটির কর্মী, তার অতীত ইতিহাস কি? কি কি অধ্যায় অতিক্রম করে সে বর্তমান স্থানে উপনীত হয়েছে? তাছাড়া বর্তমানে তার সম্মুখে যে কর্মসূচী রয়েছে, তার আদর্শিক ও দার্শনিক ভিত্তিই বা কি?

এ পুস্তিকায় সংক্ষেপে এসবগুলো কথাই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে করে জামায়াতের এই পরিচয় আমাদের দাওয়াতী কাজে সাহায্যকারী হতে পারে।

আবুল আ'লা

লাহোর ৭ মহররম ১৩৭১ হিঃ
৮ অক্টোবর ১৯৫১ ঈসায়ী

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

উদ্দেশ্য ও নীতি

উদ্দেশ্য

যে মহান উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তা হলোঃ

"মানব জীবনের গোটা ব্যবস্থাকে তার সমস্ত দিক ও বিভাগ (দর্শন, দৃষ্টিভংগি, ধ্যান ধারণা, ধর্ম ও নৈতিকতা, চরিত্র ও আচরণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি ও রাজনীতি, আইন ও আদালত, যুদ্ধ ও সন্ধি এবং যাবতীয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) সহ আল্লাহর দাসত্ব এবং নবীগণের হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া।"

প্রথম দিন থেকেই এউদ্দেশ্য আমাদের সামনে ছিল। আজো এউদ্দেশ্য হাসিলের জন্যেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এছাড়া দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য কখনো আমাদের সামনে ছিলনা। আজো নেই। ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতেও থাকবেনা। আজ পর্যন্ত আমরা যে কাজের প্রতি আগ্রহ এবং আকর্ষণ দেখিয়েছি তা কেবল এউদ্দেশ্য হাসিলের জন্যেই দেখিয়েছি। আর কেবল ততোটুকুই দেখিয়েছি আমাদের জানামতে যতোটুকু ছিল এউদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত।

এই যে জিনিসটি 'যেটি প্রতিষ্ঠা করা আমাদের উদ্দেশ্য' কুরআনের পরিভাষায় তার অর্থবহ নাম হলো 'দীনে হক'। অর্থাৎ এটা সেই জীবন ব্যবস্থা বা দীন, যা সত্যের (নবীগণের আনীত হিদায়াত অনুযায়ী আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের) উপর প্রতিষ্ঠিত । কিন্তু এটাকে বুঝাবার জন্যে আমরা কখনো কখনো ('হুকুমতে ইলাহিয়া') পরিভাষাটি ব্যবহার করছি। এর অর্থ অন্যদের নিকট যা-ই হোক না কেন, আমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলাকে প্রকৃত শাসক ও হুকুমকর্তা স্বীকার করে নিয়ে গোটা ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনকে তাঁর শাসন ও হুকুমের অধীনে পরিচালিত করাই কেবল এর অর্থ। এ হিসেবে শব্দটি পুরোপুরি 'ইসলাম' এর সমার্থক। এরই ভিত্তিতে আমরা এই তিনটি পরিভাষা (দীনে হক, হুকুমতে ইলাহিয়া, ইসলাম) সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করি। আর সেই মহান উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা সংগ্রামের নাম দিয়েছি আমরা 'ইকামতে দীন' 'শাহাদতে হক' 'ইসলামী আন্দোলন'। এর মধ্যে প্রথমোক্ত দু'টি পরিভাষা কুরআন থেকে গৃহীত হয়েছে। আর শেষোক্ত শব্দটি

সাধারণভাবে পরিচিত হবার কারণে গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে কোনো একটি পরিভাষার ব্যাপারে যদি কারো আপত্তি থাকে, তবে তিনি আমাদের পরিভাষা থেকে নিজের মনমতো অর্থ গ্রহণ করার কারণেই সে আপত্তি সৃষ্টি হয়েছে। আমরা যে অর্থে ব্যবহার করি সে অর্থে যদি গ্রহণ করতেন তবে তার কোনো অভিযোগ করার সম্ভাবনা ছিল না।

আমাদের দাওয়াত গোটা মানবজাতির জন্যে

আমাদের মতে, ইসলাম জন্মসূত্রের মুসলমানদের পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। বরঞ্চ আল্লাহর এ নিয়ামত তিনি গোটা বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির জন্যে পাঠিয়েছেন। এহিসেবে কেবল মুসলমানদেরই নয়, বরং গোটা মানবজাতির জীবনকে সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আর উদ্দেশ্যের এই ব্যাপকতা স্বাভাবিকভাবেই দাবী করে, আমাদের আহবান যেন হয় সার্বজনীন এবং কোনো বিশেষ জাতির স্বার্থকে সামনে রেখে যেন আমরা এমন কোনো কর্মপন্থা অবলম্বন না করি, যা ইসলামের এই সার্বজনীন আহবানকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, কিংবা মূল উদ্দেশ্যের সাথে হবে সাংঘর্ষিক। মুসলমানদের প্রতি আমাদের আকর্ষণ একারণে নয় যে, আমরা তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছি এবং তারা আমাদের জাতির লোক। বরঞ্চ তাদের প্রতি আমাদের আকর্ষণের কারণ কেবল এটাই যে, তারা ইসলামকে মানে। পৃথিবীতে নিজেদের ইসলামের প্রতিনিধি মনে করে। গোটা মানবজাতির কাছে ইসলামের আহবান পৌছানোর জন্যে তাদেরকেই মাধ্যম বানানো যেতে পারে। আর পূর্ব থেকে যারা মুসলমান রয়েছে, তাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে ইসলামের সঠিক নমুনা পেশকরা ছাড়া অন্যদের নিকট ইসলামের আহবান আকর্ষণীয় ও প্রভাবশালী করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এই মূলনীতির ভিত্তিতে সবসময় ঐ সমস্ত লোকদের পথ থেকে আমাদের পথ পৃথক ছিল এবং আজো আছে, মুসলমানদের প্রতি যাদের আকর্ষণের মূল কারণ হলো, তারা তাদেরই জাতির লোক। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রতি তাদের কোনো আকর্ষণ নেই, কিংবা থাকলেও একারণে যে, এটা তাদের জাতির ধর্ম।

ইসলাম, মুসলিম জাতীয়তাবাদ এবং আমরা

আমরা আমাদের যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছি, তা অর্জনের লক্ষ্যে আমরা আমাদের আন্দোলনের জন্যে অনুকূল কর্মনীতি অবলম্বন করেছি। আমরা একদিকে সাধারণভাবে সকল মানুষের কাছে সেই মহান উদ্দেশ্যের দাওয়াত পৌছে দিচ্ছি। অপর দিকে যারা পূর্ব থেকেই মুসলমান তাদেরকে জ্ঞান ও চরিত্রের দিক থেকে ইসলামের পূর্ণাংগ ও যথার্থ সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে তৈরী

করছি। আমরা কখনো ইসলাম এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদের পার্থক্যকে চোখের আড়াল হতে দিইনি। ইসলামের আদর্শ, বিধিমালা এবং ইসলামী দাওয়াতের স্বার্থকে আমরা সবসময় জাতি এবং জাতীয় স্বার্থের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছি। যেখানেই এদুটির মধ্যে প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে এক মুহূর্তের জন্যেও ইসলামের স্বার্থে আমরা জাতি ও জাতীয় স্বার্থের সাথে লড়াই করতে দ্বিধা সংকোচ করিনি। আমরা মুসলমানদের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার জন্যে চেষ্টা করে থাকলে, তা এজন্যে করিনি যে, অন্যান্য জাতির মতো এ জাতিটিরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় থাকুক, বরঞ্চ তা কেবল এ জন্যেই করেছি, পৃথিবীতে সত্যের সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে যেন জাতিটি বেঁচে থাকে। আমরা একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যদি চেয়ে থাকি, তবে তা এজন্যে চাইনি যে, পৃথিবীতে আরো একটি তুরস্ক, মিশর বা ইরানের জন্ম হোক।[১] বরঞ্চ কেবল এ উদ্দেশ্যেই চেয়েছিলাম, যেন একটি নিরেট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পৃথিবীর সামনে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাংগ নমুনা উপস্থিত করবে।

ঐ সমস্ত লোকদের পক্ষে কখনো আমাদের এই অবস্থানকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, যারা ইসলাম এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদকে একাকার করে ফেলেছে। কিংবা জাতিকে দীনের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। অথবা, দীনের পরিবর্তে কেবল জাতির ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে। আমাদের আর তাদের পথ কখনো কোনো স্থানে এসে যদি একত্র হয়েও থাকে, তবে তা নিতান্তই সাময়িকভাবে হয়েছে এবং ঐ স্থানেই হয়েছে, যেখানে ঘটনাচক্রে ইসলাম আমাদেরকে ও তাদেরকে একত্র করে দিয়েছে। তা না হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের এবং তাদের চিন্তা পদ্ধতি ও কর্মপদ্ধতিতে বৈপরীত্য ও সংঘাতই বর্তমান। এই বৈপরীত্য ও সংঘাতের ফলে আমাদেরকে বারবার 'গাদ্দারীর' ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছে। কিন্তু এ ভর্ৎসনা আমাদের জন্যে সম্পূর্ণ অর্থহীন। আমরা কেবল আল্লাহ এবং রাসূলের জন্যেই এই অধিকার মনে করি যে, কেবল তাদের কাছেই আমাদেরকে বিশ্বস্ত হতে হবে। এরপর আমাদেরকে ঐ সমস্ত লোকদের কাছে বিশ্বস্ত হতে হবে, যারা আল্লাহ এবং রাসূলের বাধ্যগত ও বিশ্বস্ত। এই বিশ্বস্ততা থেকে বিচ্যুত হওয়াকে আমরা অবশ্যই আমাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালের অভিশাপ মনে করি। এই বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে যদি আমরা

১. প্রকাশ থাকে যে পুস্তিকাটি ১৯৫১ সালে লেখা হয়েছে। এ রাষ্ট্রগুলোর তৎকালীন অবস্থাই লেখকের সামনে ছিল— অনুবাদক

অটল অবিচল থাকি, তবে অপর যেকোনো জিনিসের ক্ষেত্রে আমাদেরকে 'গাদ্দার' মনে করা হোকনা কেন, সেটা আমাদের জন্যে লজ্জার বিষয় নয়, বরং গর্বের বিষয়।

দীন সম্পর্কে আমাদের ধারণা

'দীনে হক' এবং 'ইকামতে দীন' এর যে ধারনা আমরা পোষণ করি, সেক্ষেত্রেও আমাদের এবং অন্য কিছু লোকের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। আমরা 'দীনকে' কেবল পূজা পার্বণ এবং নিদিষ্ট কয়েকটি ধর্মীয় বিশ্বাস ও রসম রেওয়াজের সমষ্ঠি মনে করিনা। বরঞ্চ আমাদের মতে, এ শব্দটি জীবন পদ্ধতি ও জীবন ব্যবস্থার সমার্থক। এই দীন মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত। জীবনকে পৃথক পৃথক অংশে ভাগ করে পৃথক পৃথক স্কীমের অধীন পরিচালনা করা যেতে পারে বলে আমরা মনে করিনা। আমাদের মতে জীবনকে এভাবে ভাগ করা হলেও তা স্থায়ী হতে পারেনা। কারণ, মানব জীবনের বিভিন্ন দিক মানব দেহের বিভিন্ন অংশের মতোই একটি অপরটি থেকে স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর এমনভাবে সংযুক্ত হয়ে আছে যে, সবগুলি মিলিত হয়ে একটি এককে পরিণত হয়ে আছে এবং একটি প্রাণই তাদেরকে জীবিত রাখে ও পরিচালিত করে। এই প্রাণ যদি আল্লাহ এবং পরকাল থেকে বিমুখ এবং নবীগণের শিক্ষা থেকে সম্পর্কহীন প্রাণ হয়, তবে জীবনের গোটা কাঠামোই একটি ভ্রান্ত দীনে পরিণত হয়ে যায়। এর সাথে যদি খোদামুখী ধর্মের সংযোগ রাখাও হয়, তবে গোটা কাঠামোর প্রকৃতি ক্রমান্বয়ে সেটাকে গ্রাস করে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত সেটা সম্পূর্ণরূপে খালি হয়ে যায়। আর এই প্রাণ যদি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুসরণ ও অনুবর্তণের প্রাণ হয়, তবে তার দ্বারা গোটা জীবন কাঠামো একটি সত্য দীনে পরিণত হয়ে যায়। তার কার্যপরিধির মধ্যে খোদার অবাধ্যতার কোনো ফিতনা কোথাও যদি থেকেও যায়, তবে তা সহসা মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠতে পারেনা। এ কারণেই আমরা যখন 'ইকামতে দীন' শব্দ ব্যবহার করি, তখন তার অর্থ কেবল মাত্র মসজিদে দীন কায়েম করা কিংবা কয়েকটি ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাস ও নৈতিক বিধান প্রচার করাই আমরা বুঝাইনা। বরঞ্চ, আমাদের নিকট এর অর্থ হলো, ঘরবাড়ী, মসজিদ, মাদ্রাসা, কলেজ ইউনিভার্সিটি, হাট বাজার, থানা, সেনানিবাস, কোর্ট কাচারী, সংসদ, মন্ত্রীসভা, দূতাবাস, সর্বত্রই সেই এক খোদার দীন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যাকে আমরা আমাদের রব এবং মা'বুদ বলে মেনে নিয়েছি। আর এসব কিছুর ব্যবস্থাপনা সেই রাসূলের (সা) শিক্ষানুযায়ী পরিচালিত করতে হবে, যাঁকে আমরা আমাদের প্রকৃত পথ

প্রদর্শক বলে স্বীকার করে নিয়েছি। আমাদের কথা হলো, আমরা যদি মুসলমান হয়ে থাকি, তবে আমাদের প্রত্যেকটি জিনিসকেই মুসলমান হতে হবে। আমাদের জীবনের কোনো একটি দিক ও বিভাগকে আমরা শয়তানের হাতে সমর্পণ করতে পারিনা। আমাদের সবকিছুর মালিক আল্লাহ। এতে শয়তান বা কাইজারের কোনো অংশ নেই।

আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগঃ

আমাদের এসব বক্তব্যে কিছু লোক অসন্তুষ্ট হয়। এরা হলো তারা, যারা ধর্মের একটি সীমাবদ্ধ ধারণা নিজেদের মনে বদ্ধমূল করে নিয়েছে। এরা দীন ও দুনিয়া এবং ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক পৃথক জিনিস মনে করে। তাদের মতে এগুলোর একটির সাথে অপরটির কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের মতে, মানুষের জীবন খোদা এবং কাইজারের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা হতে পারে এবং হওয়া উচিত। তারা মনে করে, খোদা ভক্তির ধর্ম, খোদাহীন সভ্যতা ও রাজনীতির সাথে জীবনের বিভক্তি গ্রহণ করা যেতে পারে এবং মসজিদ আর খানকা নিজের হাতে রেখে বাকী সবকিছু শত্রুর হাতে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে।

আমাদের সম্পর্কে এরা বিভিন্ন প্রকার অভিযোগ ও আপত্তি উত্থাপন করেঃ

ক. ধর্ম ও রাজনীতি

কেউ বলেঃ 'তোমরা ধর্ম প্রচার করো, কিন্তু আবার রাজনীতিতে অংশ নেও কেন?' আমরা বলিঃ

"দীন যদি কর জুদা রাজনীতি রেখে
তবে তো কেবল চেংগিজীই যায় থেকে।"

তবে কি তারা এটাই চান যে, আমাদের রাজনীতিতে চেংগিজী জেঁকে বসে থাকুক আর আমরা মসজিদে বসে ধর্ম প্রচার করতে থাকি? আসলে তারা আমাদেরকে কোন্ ধর্মটি প্রচার করার কথা বলছেন? সেটা যদি পাদ্রীদের ধর্ম হয়ে থাকে, রাজনীতিতে যার প্রবেশাধিকার নেই, তবে আমরা সে ধর্মের প্রতি ঈমান রাখিনা। আর সেটা যদি কুরআন ও হাদীসের ধর্ম হয়ে থাকে, যার প্রতি আমরা ঈমান রাখি, তবে তা রাজনীতিতে কেবল প্রবেশাধিকারই দেয়না, বরঞ্চ রাজনীতিকে নিজের একটি অপরিহার্য অংগ বানিয়ে রাখতে চায়।

কেউ বলেনঃ 'তোমরা প্রথমত ধর্মীয় লোকই ছিলে, কিন্তু এখন রাজনৈতিক গোষ্ঠী হয়ে গেছো।' অথচ আমাদের অবস্থা তাদের এই অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। আমরা এমন একটি দিনও অতিবাহিত করিনি যখন আমরা অরাজনৈতিক ধর্ম অনুযায়ী 'ধর্মীয়' ছিলাম আর এখন ধর্মহীন

রাজনীতি অনুযায়ী 'রাজনৈতিক' হয়ে গেছি। আমরা তো কেবল ইসলামের অনুসারী এবং কেবলমাত্র ইসলামকেই প্রতিষ্ঠা করতে চাই। ইসলাম যতোটা 'ধর্মীয়' আমরা ততোটাই 'ধর্মীয়' আছি এবং প্রথমদিন থেকেই ছিলাম। আর ইসলাম যতোটা 'রাজনৈতিক' আমরাও প্রথমদিন থেকে কেবল ততোটাই 'রাজনৈতিক' ছিলাম এবং আজো আছি। আপনারা আমাদেরকে সেদিনও বুঝতে পারেননি, যখন আমাদেরকে 'ধর্মীয় সম্প্রদায়' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। আর আজো বুঝতে পারেননি যখন আমাদেরকে 'রাজনৈতিক দল' বলে অভিহিত করছেন। ধর্ম ও রাজনীতির ব্যাপারে আপনাদের গুরু হচ্ছে ইউরোপ। একারণে আপনারা ইসলামকেও বুঝতে পারেননি, আর আমাদেরকেও।

কারো কারো অভিযোগ হচ্ছেঃ খোদা তো কেবল উপাস্য মা'বুদ। তোমরা কেমন করে তাঁর জন্যে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রমাণ করছো? তোমাদের প্রতি অভিশাপ, তোমরা মানুষের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে, সে কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করছো। এটাতো নিরেট 'খারেজী মতবাদ'। কারণ খারেজীরা তোমাদেরই মতো إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ (কর্তৃত্ব–সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহর জন্যে)–র দাবীদার।

কিন্তু আমরা মনেকরি, কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে আল্লাহ কেবল উপাস্যই নন। বরঞ্চ আনুগত্য ও দাসত্ব লাভের অধিকারও কেবলমাত্র তাঁরই জন্যে। এর মধ্যে যে অধিকারের ক্ষেত্রেই আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক করা হোকনা কেন, তা হবে শিরক। কোনো বান্দার আনুগত্য যদি করা যেতে পারে, তবে কেবল আল্লাহর শরয়ী অনুমতির ভিত্তিতেই করা যেতে পারে আর তাও কেবল আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমার ভেতর। খোদার আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে, স্বাধীন আনুগত্যের দাবীদার হবার অধিকার তো রাসূলেরও (সা) নেই। সেক্ষেত্রে কোনো মানবরাষ্ট্র কিংবা রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার অধিকারের তো প্রশ্নই উঠেনা। যে আইন আদালত ও রাষ্ট্রে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহকে চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী (FINAL AUTHORITY) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়না, যেখানে এই মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত যে, সামাজিক জীবনের সমগ্র বিষয়ের মূল ও শ্রেণী বিভাগ নির্ণয়ের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের, আর যেসব আইন পরিষদে খোদায়ী বিধানের প্রতি প্রত্যাবর্তণ করার প্রয়োজনই স্বীকৃত নয় এবং বাস্তবেও এর বিপরীত আইন প্রণয়ন করা হয়, সেসবের আনুগত্য করা তো দূরের কথা, কুরআন এবং হাদীসে তা বৈধ হবারই কোনো প্রমাণ বর্তমান নেই। এ বিপত্তিকে খুব বেশী হলে ঐ অবস্থায় কেবলমাত্র বরদাশত করা যেতে পারে, যখন মানুষ তার ক্ষমতার খপ্পরে বন্দী হয়ে পড়ে।

কিন্তু, যে ব্যক্তি এধরনের রাষ্ট্র ও সরকারের কর্তৃত্বের অধিকার স্বীকার করে নেবে এবং খোদয়ী নির্দেশাবলী পরিত্যাগ করে, 'মানুষ নিজেই নিজের সমাজ, কৃষ্টি, রাজনীতি ও অর্থনীতির মূলনীতি ও আইন কানুন প্রণয়নের বৈধ কর্তৃপক্ষ' একথাকে একটি সঠিক মূলনীতি হিসেবে স্বীকার করে নেবে, সে ব্যক্তি যদি খোদাকে স্বীকার করে, তবে সে অবশ্যি শির্কে নিমজ্জিত।

আমাদের এই মত ও নীতিকে 'খারেজী' মতবাদ বলে ব্যাখ্যা করা আহলুস সুন্নাত এবং খারেজী মতবাদ সম্পর্কে অজ্ঞতারই প্রমাণ। আহলুস সুন্নাতের আলেমগণের লিখিত উসূলের গ্রন্থাবলীর যেটি ইচ্ছা খুলে দেখুন। দেখবেন, তাতে লেখা রয়েছে হুকুমদানের অধিকার আল্লাহর জন্যে নিদিষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ আল্লামা আমিদীর গ্রন্থ দেখুন, তিনি তাঁর 'আল আহকাম ফী উসূলিল আহকাম' গ্রন্থে লিখেছেনঃ

اعلم انه لاحاكم سوى الله ولا حكم الاماحكم به

"জেনে রাখো, হুকুমকর্তা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নেই। আর আল্লাহ্ যে হুকুম দিয়েছেন তাছাড়া কোনো হুকুম নেই।"

শায়খ মুহম্মাদ খিদরী তাঁর 'উসূলুল ফিকহ্' গ্রন্থে লিখেছেনঃ

الحكم هو خطاب الله فلا حكم الا لله وهذه قضية اتفق عليها المسلمون قاطبة-

"হুকুম হচ্ছে আল্লাহ্র নির্দেশ ও ফরমানের নাম। সুতরাং হুকুম দেবার অধিকার আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। এটা এমন একটি মীমাংসিত ব্যাপার, যে ব্যাপারে সকল মুসলমান একমত।"

এখানে উদাহরণ হিসেবে আমরা দু'জন খারেজীর (?) বক্তব্য উল্লেখ করলাম। এ ধরনের খারেজীর (?) তালিকা যতো চান দীর্ঘ করা যেতে পারে।

খ. ইসলামী রাষ্ট্র

এমন কিছু লোক আছে, যারা বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেঃ 'এই ইসলামী রাষ্ট্র বা হুকুমতে ইলাহিয়ার প্রতিষ্ঠা কোন্ নবীর দাওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল?' কিন্তু আমরা জিজ্ঞেস করছি, এই যে কুরআনে এবং তাওরাতে আকীদা ও ইবাদতের সাথে সাথে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, যুদ্ধ ও সন্ধির বিধান, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিয়ম কানুন এবং রাজনৈতিক কাঠামোর মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো কি শাস্ত্র চর্চার জন্যেই আলোচিত হয়েছে? কিতাবুল্লাহর শিক্ষার যে অংশ আপনার ইচ্ছা মানবেন আর যে অংশ ইচ্ছা

অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে গণ্য করবেন, একাজটি কি আপনার ইচ্ছার স্বাধীনতার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে? পূর্ববর্তী নবীগণ (আ) এবং আখেরী নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটা কি তাদের নবুয়্যতী মিশনের অন্তর্ভূক্ত ছিলনা? তাঁরা কি কেবল সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিজেদের রাজত্বের আকাংখা পূর্ণ করেছিলেন? পৃথিবীতে কি কেবল পঠন পাঠনের উদ্দেশ্যে কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়, যেটাকে বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার কোনো উদ্দেশ্য থাকে না? আমরা প্রতিদিন নামাযে আল্লাহর কিতাবের সেইসব আয়াত পাঠ করবো যেগুলোতে জীবনের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে মূলনীতি ও বিধান বর্ণনা করা হয়েছে আর রাতদিন আমাদের জীবনের অধিকাংশ কাজ কারবার সেগুলোর বিপক্ষে পরিচালিত করবো, ঈমান কি সত্যিই এই জিনিসের নাম?

আমাদের কর্মনীতি

আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব ও গোলামীর উপর আমাদের গোটা জীবন কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। এ ব্যাপারেও আমাদের একটি সুস্পষ্ট কর্মনীতি আছে। আর আমাদের এ কর্মনীতিকেও বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দল উপদল বিভিন্ন কারণে পছন্দ করেনা। আমাদের মতে কোনো ব্যক্তির এই স্বাধীনতা নেই যে, সে নিজ ইচ্ছা ও মর্জিমতো আল্লাহর দাসত্ব ও বন্দেগী করবে। বরঞ্চ তাঁর দাসত্ব ও বন্দেগী করার সঠিক পন্থা কেবলমাত্র একটিই। আর তা হলো, সেই শরীয়তের অনুসরণ ও অনুকরণ করা যা নিয়ে এসেছেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)। এশরীয়তের ব্যাপারে আমরা কোনো মুসলমানের এরূপ অধিকারকে স্বীকার করিনা যে, সে এর যতোটুকু ইচ্ছা গ্রহণ করবে আর যতোটুকু ইচ্ছা বর্জন করবে। বরঞ্চ আমরা মনে করি, আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম মানা এবং মুহাম্মদ (সা) এর শরীয়ত অনুযায়ী চলার নামই হচ্ছে ইসলাম। আমাদের মতে শরীয়তের জ্ঞান অর্জনের উপায় হলো কুরআন। সেই সাথে রাসূলের হাদীসও। আর কুরআন হাদীস থেকে যুক্তি ও দলিল গ্রহণের সঠিক পন্থা এটা নয় যে, কোনো ব্যক্তি নিজের দৃষ্টিভংগি ও মতবাদের ভিত্তিতে আল্লাহ্ ও রাসূলের (সা) হিদায়াতকে ঢেলে সাজাবে। বরঞ্চ এর সঠিক পন্থা হলো, ব্যক্তি তার যাবতীয় দৃষ্টিভংগি ও মতবাদকে আল্লাহ্ ও রাসূলের (সা) হিদায়াতের ভিত্তিতে যাচাই করবে। তাছাড়া আমরা এমন কোনো জড় জমাট তাকলীদের সমর্থক নই, যেখানে ইজতিহাদের কোনো অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে আমরা এমন ইজতেহাদেরও সমর্থক নই যে, প্রত্যেকটি পরবর্তী বংশ (GENERATION) পূর্ববর্তী বংশধরদের সমস্ত কার্যক্রমকে উপেক্ষা করবে এবং সম্পূর্ণ নতুন অট্টালিকা তৈরীর চেষ্টা করবে।

এই কর্মনীতির প্রতিটি অংশ এমন, যার ফলে আমাদের জাতির কোনো না কোনো গোষ্ঠী আমদের উপর অসন্তুষ্ট। কেউ কেউ তো আল্লাহ্র বন্দেগীরই সমর্থক নয়। কেউ শরীয়ত থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের মন মতো আল্লাহ্র বন্দেগী করতে চায়। কেউ আবার শরীয়তের উপর নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চায়। তাদের দাবী হলো, যা কিছু তাদের পছন্দসই তাই শরীয়তে থাকবে, আর যা তাদের অপছন্দনীয় তা শরীয়ত থেকে খারিজ করে দিতে হবে। আবার কেউ কুরআন হাদীসকে উপেক্ষা করে নিজেদের মনগড়া নীতিমালার নাম দিয়েছে 'ইসলাম' । কেউ হাদীস ত্যা গকরে কেবল কুরআনকে মানে। কেউ আদর্শ ও দৃষ্টিভংগি অন্যখান থেকে আমদানী করে এনেছে, কিংবা নিজেদের মনমতো তৈরী করে নিয়েছে। অতপর কুরআন ও হাদীসের বাণীকে জোর জবরদস্তি করে সেগুলোর পক্ষে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছে। কেউ বাড়াবাড়ি করছে জড় জমাট তাকলীদের পক্ষে। আবার কেউ অতীতের সমস্ত ইমামগণের মহান কার্যক্রমকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করে নতুন নতুন ইজতিহাদ করতে চাইছে।

কর্মনীতিগত মতপার্থক্যের অধিকার

উপরোক্ত সমস্ত দল ও গোষ্ঠী থেকে আমাদের পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাধ্য হয়েই আমাদেরকে তাদের সাথে মতপার্থক্যও করতে হয় এবং তাদের বিরোধীতা সত্ত্বেও নিজেদের কর্মনীতিরও প্রচার করতে হয়। একইভাবে অন্যদের জন্যেও আমরা এই অধিকার স্বীকার করি, যে বিষয়ে তাঁরা আমাদেরকে ভুলের উপর মনে করবেন, সে বিষয়ে তাঁরা আমাদের সাথে মতপার্থক্য করবেন এবং আমাদের মতবিরোধ সত্ত্বেও নিজেদের কর্মনীতির প্রচার করবেন। এখন যে কোনো চোখ খোলা লোকই পরখ করে দেখতে পারেন, সমালোচনা ও প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদের রীতি কিরূপ? পক্ষান্তরে আমাদের বিরোধিরা আমাদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে কতোটুকু ভদ্রতা, সততা, সুবিচার ও যুক্তিগ্রাহ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন?

কাজের সূচনা

প্রথম অধ্যায়ঃ সমালোচনা এবং প্রচার ও প্রশিক্ষণ

পূর্বেই বলেছি, যে দাওয়াত নিয়ে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, প্রথম দিন থেকেই সত্য দীনকে তার প্রকৃত ও পরিপূর্ণ স্বরূপের ভিত্তিতে গোটা জীবন ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। এই মাকসাদের বিভিন্ন দিকের সাথে বিভিন্নপন্থী মুসলমান ব্যক্তি ও দলের যে যে ধরনের মতপার্থক্য রয়েছে, সেগুলোর প্রতিও সংক্ষিপ্ত ইংগিত করেছি। বিগত আঠারো বছর এ আন্দোলন কি কি অধ্যায় অতিক্রম করেছে এবার একটু বিস্তৃতভাবে সেটা আলোচনা করতে চাই। কেবল ইতিহাস বলাই এ আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আমরা এযাবত যে কাজ করেছি এবং যেভাবে করেছি, আমরা চাই লোকেরা ভালভাবে তা হৃদয়ংগম করুক, যাতে করে আগামীতে আমরা যা কিছু করতে চাই তা বুঝা তাদের পক্ষে সহজ হয়।

মুসলমান চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবি শ্রেণীকে ইসলামের অনুসারী বানানো

১৯৩৩ ঈসায়ীতে (১৩৫২ হিঃ) যখন এ আন্দোলনের সূচনা করা হয়, তখন মুসলমান চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর লোকদেরকে ইসলামের প্রকৃত অনুসারী বানানোর চেষ্টা করাই ছিলো আমাদের সামনে প্রথম কাজ।

সাধারণভাবে সকল মানুষের পরিবর্তে বিশেষভাবে আমরা মুসলমানদেরকে এজন্যে সম্বোধন করেছি, যেহেতু তারা পৃথিবীতে মুসলমান ও ইসলামের জীবন্ত প্রতিনিধি। তারা নিজেদের এই অবস্থানের ব্যাপারে সচেতন থাকুক কিংবা না থাকুক, বিশ্ববাসী তাদেরকে বাদ দিয়ে শুধু তত্ত্বগত ইসলামকে বুঝবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারেনা। যখনই তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হবে, তখন অবশ্যই ঐ সমস্ত লোকদের প্রতি তারা তাকাবে, যারা পূর্ব থেকে এ দীনের অনুসারী। তাই এরা যদি নিজেদের জীবনে মানবতার জন্যে কোনো সম্মোহনী নমুনা উপস্থাপন করতে না পারে, তাহলে বিশ্ববাসী নিজেদের সাফল্য ও কল্যাণের আশায় এ দীনকে গ্রহণ করবে, এমনটি আশা করা খুবই কঠিন। তাই পৃথিবীতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে বিজয়ী করার জন্যে সকল মুসলমান না

হলেও, অন্ততপক্ষে এমন একটি দল অবশ্যি বর্তমান থাকতে হবে, যারা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে ইসলামের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করবে।

মুসলমানদের মধ্যেও আমরা কেবল চিন্তাশীল ও বুদ্ধি বিবেকের অধিকারী লোকদের কাছেই ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছি। কারণ, কোনো জাতির চিন্তাশীল ও বুদ্ধি বিবেকের অধিকারী লোকরাই সে জাতির পথপ্রদর্শক হয়ে থাকে। জীবনে তারা যে পথই অবলম্বন করে, সাধারণ মানুষ সেপথেই তাদের অনুসরণ করে। এজন্যে, সাধারণ মুসলমানদের ধ্যান ধারণা ও চরিত্রগত সংশোধনের পূর্বে সেই বিশেষ লোকদের সংশোধনের প্রতি আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করেছি, যারা নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক যোগ্যতার কারণে জাতিকে পথপ্রদর্শণ করে। বিশেষভাবে এদের প্রতি মনোযোগ দেয়ার আরো একটি কারণ আছে। সেটা হলো, সামাজের সর্বসাধারণ মানুষের সংশোধনের জন্যে আমরা যে কাজ করতে চাই, সেটার জন্যে জ্ঞান বুদ্ধির অধিকারী কর্মীই আমাদের প্রয়োজন। আর তা এ শ্রেণীর লোকদের মধ্য থেকেই পাওয়া যেতে পারে।

সংশোধনের ক্ষেত্রেও আমরা চারিত্রিক সংশোধনের উপর চিন্তা ও মানসিক সংশোধনকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। কেননা ধ্যান ধারণাই চরিত্র ও আচরণের মূল কারণ হয়ে থাকে। ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের কোনো চারিত্রিক পরিবর্তন আসতে পারে না, যতোক্ষণ না তাদের দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন হবে, চিন্তা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসবে এবং মূল্যবোধ পরিবর্তিত হবে।

এটা ছিল সেই দাওয়াতের পথে আমাদের পয়লা কদম। এছিল নিরেট সমালোচনা এবং প্রচার ও প্রশিক্ষণের অধ্যায়। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত পূর্ণ নয় বছর এ অধ্যায় প্রলম্বিত হয়।

জাহিলিয়াতের প্রতিটি দিক ও বিভাগের সমালোচনা

এসময় একদিকে জাহিলিয়াতের প্রতিটি দিক ও বিভাগের সমালোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন শির্কমূলক এবং বৈরাগ্যবাদী জাহিলিয়াতের সমালোচনা করা হয়েছে। আধুনিক পাশ্চাত্য জাহিলিয়াতের সমালোচনা করা হয়েছে। সেসব জাহিলী ধারণার সমালোচনা করা হয়েছে, আমাদের অতীত ইতিহাসে আমরা যেগুলোকে গ্রহণ করেছি। ঐসব জাহিলিয়াতেরও সমালোচনা করা হয়েছে, বর্তমানে আমাদের জীবনে আমরা যেগুলোর প্রভাব গ্রহণ করেছি। এসব জাহিলিয়াতের সমালোচনা করে সেগুলোর বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতা এবং নৈতিক ও সামাজিক ক্ষতির বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। পরিপূর্ণ মূল্যায়ণ করে চিন্তার ভিত্তি এবং চারিত্রিক পরিণতির দিক থেকে ইসলামের পথ সেই সব

জাহিলিয়াত থেকে কিভাবে কতোটা শ্রেষ্ঠ তা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। একইভাবে মুসলমানদের বিভিন্ন চিন্তার স্কুল (SCHOOL OF THOUGHTS) এর সমালোচনা করা হয়েছে। ফিক্‌হী জড়তার সমর্থকদের সমালোচনা করা হয়েছে। স্বাধীন ইজতিহাদের দাবীদারদের সমালোচনা করা হয়েছে। হাদীস অস্বীকারকারীদের সমালোচনা করা হয়েছে। হাদীসের ব্যাপারে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। যারা ধর্ম থেকে নিজেদের মুক্ত মনে করে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। যারা ধর্মকে নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসারী বানিয়ে নিয়েছে, তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। এই গোটা সমালোচনার কাজে আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো, মুসলমান চিন্তাশীলদের মানসিক জটিলতা দূর করা। যে জটিলতার কারণে তাদের জন্যে ইসলামকে বুঝা এবং কল্পনার জংগলে ইসলামের রাজপথকে পরিষ্কারভাবে দেখা তাদের জন্যে কষ্টকর হচ্ছিল। তাই যখনি আমাদের সমালোচনায় রাগান্বিত হয়ে কেউ আমাদেরকে বিতর্কে জড়িত করতে চেয়েছে এবং বারবার চেয়েছে, আমরা একাজে জড়িত হতে অস্বীকার করেছি। কেননা, এসব বিতর্ক আমাদের ইপ্সিত ছিলনা। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য পথ পরিষ্কার করার জন্যে এগুলোকে প্রয়োজনীয় হিসেবে গ্রহণ করেছি এবং এগুলোর সাথে জড়িত হয়ে আমাদের পথকে অপবিত্র করতে প্রস্তুত হইনি।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে প্রামাণ্য ও যুক্তিপূর্ণ পন্থায় উপস্থাপন করা

আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নায় যেভাবে ইসলামের গোটা জীবন ব্যবস্থা চিত্রিত হয়েছে এ অধ্যায়ে তা প্রামাণ্য ও যুক্তিপূর্ণ পন্থায় বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমরা সুস্পষ্টভাবে পেশ করার চেষ্টা করেছি, ইসলামের আকীদা বিশ্বাস কি? ঈমানের পরিচয় কি? বিশ্বজগত ও মানুষ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভংগি কি? তার নৈতিক দর্শন কি? তার যাবতীয় ইবাদতের উদ্দেশ্য কি? মানুষের চরিত্র ও আচরণকে সে কোন্ ছাঁচে ঢেলে সাজাতে চায়? তার সভ্যতার মৌলিক নীতিমালা কি? সে তার সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সামাজিক ব্যবস্থা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে কি কি নিয়মনীতি চালু করতে চায়? তার প্রকৃতির সাথে কোন্ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা সামঞ্জস্যশীল? অতীতে সে মানব জীবনের সমস্যাবলী কিভাবে সমাধান করে এসেছে আর বর্তমানেই বা কিভাবে সমাধান করতে পারে? আমাদের সাধ্যানুযায়ী আধুনিক শিক্ষিত লোকদের সন্তুষ্ট করবার মতো পন্থায় আমরা এ বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছি। কিন্তু একাজ দ্বারা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক খেদমত আঞ্জাম দেয়াই আমাদের উদ্দেশ্য ছিলনা। বরঞ্চ প্রথমদিন থেকেই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, যারা বুঝে শুনে ইসলামের অনুসারী হবে তারা বাস্তবে যেন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে প্রস্তুত হয়। একারণেই আমরা প্রতিটি পদক্ষেপে লোকদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করবার সাথে সাথে তাদের মন

মানসিকতাকেও উৎসাহিত করবার চেষ্টা করেছি। ঈমানের দাওয়াত দেবার সাথে সাথে তাদের মন মানসিকতায় একথা বদ্ধমূল করবার চেষ্টা করেছি যে, একটি জীবনব্যবস্থা আরেকটি জীবনব্যবস্থার অধীনে থেকে চলতে ও উন্নতি লাভ করতে পারেনা। সুতরাং যারাই নিষ্ঠার সাথে ইসলামের অনুসরণ করতে চায়, তাদেরকে অবশ্যি কুফরী নেতৃত্বের পরিবর্তে ইসলামের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে জীবন বাজী রাখার জন্যে প্রস্তুত হওয়া উচিত।

আমাদের কাজের বিন্যাস

যারা এ অধ্যায়ের কাজকে ভালভাবে বুঝতে চান, তারা সনতারিখের নিম্নোক্ত বিন্যাসের ভিত্তিতে যদি আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন, তবে তাদের কাছে সেই পূর্ণাংগ চিত্র স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে, যা প্রথম দিন থেকে ১৯৪১ সালের শেষ নাগাদ আমরা আঞ্জাম দিয়েছিঃ

১৯৩৩ ঈসায়ীঃ (১) ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা (২) তাকদীরের হাকীকত।

১৯৩৩–৩৮ ঈসায়ীঃ (৩) ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব (৪) তাফহীমাত ১ম খন্ড (৫) তাফহীমাত ২য় খন্ডের অধিকাংশ প্রবন্ধাবলী।

১৯৩৫ ঈসায়ীঃ (৬) স্বামী স্ত্রীর অধিকার (৭) ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ।

১৯৩৬–৩৭ ঈসায়ীঃ (৮) ইসলাম পরিচিতি (৯) সুদ (১০) পর্দা।

১৯৩৮ ঈসায়ীঃ (১১) খুতবাত (হাকীকত সিরিজ)।

১৯৩৯ ঈসায়ীঃ (১২) ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ (১৩) ইসলামী ইবাদতের মর্মকথা।

১৯৪০ ঈসায়ীঃ (১৪) ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন (১৫) ইসলামী বিপ্লবের পথ (১৬) এক আহম এস্তেফতা।

১৯৪১ ঈসায়ীঃ (১৭) কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা (১৮) ইসলাম ও জাহিলিয়াত (১৯) নয়া নেযামে তা'লীম[২] (২০) অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান।[৩]

---

২. এ প্রবন্ধটি বর্তমানে 'তা'লীমাত' গ্রন্থে সংযুক্ত হয়েছে।

৩. 'আল জিহাদ ফীল ইসলাম' গ্রন্থটি এ সূচীতে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ গ্রন্থটি দাওয়াতী কাজ শুরু করবার পূর্বে রচিত হয়েছে। অবশ্যি একথা উল্লেখযোগ্য যে, এ গ্রন্থটি রচনা কালেই গ্রন্থকারের ইসলামের পূর্ণাংগ চিন্তা ও আমলের কাঠামো এবং প্রকৃত দাওয়াত উপলব্ধি করার সুযোগ লাভ হয়। আর সে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণই শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনের পথ সুগম করে।

এ অধ্যায়ও সম্ভবত আরো কিছুটা দীর্ঘ হতো। কিন্তু এসময় দেশের রাজনৈতিক অবস্থা যেভাবে দ্রুত পাল্টে যাচ্ছিল, তাতে আর দেরী না করে তখনই দ্বিতীয় অধ্যায়ে পা বাড়ানো জরুরী হয়ে পড়ে।

জাতীয় গণতান্ত্রিক, ধর্মহীন রাষ্ট্রের সূচনা

ইংরেজ সরকার উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায়ে ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার এবং দেশবাসীকে রাষ্ট্রক্ষমতায় অংশীদার বানাবার যে ধারাবাহিকতা শুরু করেছিল, তার গোটা বুনিয়াদ গণতন্ত্রের সেই নিয়মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, যা ইংরেজদের নিজেদের দেশে চালু ছিল। তারা মনে করেছিল ইংল্যান্ডের মতো ভারতবর্ষের অধিবাসীরাও ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে একজাতি। সুতরাং এখানেও ইংল্যান্ডের মতো এমন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা নিজেদের মত অনুসারে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা করবে। আর সংখ্যালঘু জনগণের প্রতিনিধিরা বিরোধী দলে থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অজর্নের চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

এই সাথে ইংরেজরা তাদের বিশেষ ধরনের সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী ছিল। তারা এবং তাদের শিষ্যরা এ বিশ্বাসকে একটি স্থায়ী মর্যাদা দিয়ে রাখছিল। আর তা ছিল, ধর্মের সম্পর্ক ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আমলের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং রাষ্ট্রকে অবশ্যি ধর্মহীন (SECULAR) হতে হবে। এই দৃষ্টিভংগিতে দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হচ্ছিল। এর ফলে প্রতিটি শাসনতান্ত্রিক উন্নতির সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হাতে অধিকতর ক্ষমতা হস্তান্তর হচ্ছিল। এজিনিসটি সেই সম্প্রদায়ের জন্যে পুরোপুরি লাভজনক ছিল, ভারতবর্ষের মাটিতে যারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। একারণে তারা এই ব্যবস্থা শুধু গ্রহণই করেনি, বরঞ্চ এর শক্তিশালী সহযোগী এবং সমর্থক হয়ে যায়। এই মতাদর্শের ভিত্তিতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' প্রথম দিন থেকে তার গোটা আন্দোলনের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু মুসলমানদের জন্যে এই 'জাতীয় গণতন্ত্র' এবং 'ধর্মহীন রাষ্ট্রের' প্রতিটি অংগই ছিল বিষাক্ত মারণাস্ত্র। ফলে তারা নিমজ্জিত হয়ে পড়ে এক শৃংখলিত অনিশ্চয়তার মধ্যে এবং ব্যর্থ হয় নিজেদের জন্যে কোনো সঠিক পথ বেছে নিতে।

মুসলমানদের হতাশা

প্রথম প্রথম তারা (মুসলমানরা) চেষ্টা করছিল, দেশবাসীর হাতে যেন রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরিতই না হয়। বরঞ্চ সকল ক্ষমতা ইংরেজ শাসকরা যেন নিজেদের হাতেই রেখে দেয়। কিন্তু যখন দেখা গেল এপলিসি অচল, তখন তারা

একজাতীয়তার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক নীতিকে স্বীকার করে নেয়। আর কেবলমাত্র এই চেষ্টাটুকুই করতে শুরু করে, যেন কোনো রকমে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় তাদের জন্যে আইনগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়, যার ভিত্তিতে তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারবে। অতপর খেলাফত আন্দোলনের সময় হঠাৎ করে তারা হিন্দু মুসলিম ঐক্যের শ্লোগান দিতে থাকে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিজেদেরকে পুরোপুরি তাদের হাতে সোপর্দ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। অতপর পুনরায় তারা 'আইনগত নিরাপত্তার' দাবীর প্রতি প্রত্যাবর্তণ করে। কিন্তু এ প্রশ্নে তারা ধীরে ধীরে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল বললেন, প্রথমে সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে মিলে স্বাধীনতা লাভ করতে হবে, 'নিরাপত্তার' প্রশ্ন পরে উঠানো যাবে। আরেক দল বললো, 'নিরাপত্তার' বিষয়টি আগে ফায়সালা হতে হবে, তারপরই সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে স্বাধীনতার ব্যাপারে সহযোগিতা করা যেতে পারে। কিন্তু উভয় গ্রুপের কেউই একথাটি চিন্তা করেনি যে, এক জাতিত্বের আদর্শের ভিত্তিতে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, তার মধ্যে কোনো সম্প্রদায়েরই স্বতন্ত্র জাতীয়তা অবশিষ্ট থাকতে পারেনা এবং ধর্মহীন রাষ্ট্রে কোনো ধর্মীয় সভ্যতা সংস্কৃতির লালন ও উন্নতি সম্ভব নয়!

ভারতীয় একজাতীয়তার অনিষ্টসমূহ চিহ্নিতকরণ

এমতাবস্থায় ১৯৩৫ সালের এ্যাক্ট তৈরী হয়। ১৯৩৭ সালে এই এ্যাক্টের ঐ অংশ কার্যকর হয়, যার ভিত্তিতে প্রদেশগুলোকে দায়িত্বশীল সরকারের জন্যে প্রচুর ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এখন একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছিল, ভারতীয় ইতিহাসে সেই অন্তর্বর্তীকালীন সময়টি সহসাই শেষ হয়ে যাবে, যে সময়টিতে একটি ভিন জাতির গুটিকয়েক ব্যক্তি এখানে রাষ্ট্র পরিচালনা করছিল। একথাও পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছিল, অচিরেই এখানে এমন অধ্যায় শুরু হতে যাচ্ছে, যাতে এক জাতীয়তা, গণতন্ত্র এবং ধর্মহীন নীতিমালার ভিত্তিতে এদেশেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। এসময় আসন্ন বিপদ সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে মুসলমানদের অবহিত করা আমাদের জন্যে জরুরী হয়ে পড়ে। কারণ, আমাদের সামনে একথাও পুরোপরি স্পষ্ট ছিল, এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোনো 'শাসনতান্ত্রিক নিরাপত্তা' মুসলমানদেরকে এবং তাদের সভ্যতা সংস্কৃতিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী এবং তাদের সভ্যতা সংস্কৃতির মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারবেনা। একথাও আমাদের সামনে পরিষ্কার ছিল, অনুরূপ একটি পরিবেশে আমাদের জন্যে আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল করা অসম্ভব না হলেও কঠিন অবশ্যি হবে। সুতরাং এইসব আপদের আশংকা সামনে রেখে আমরা ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত 'তরজমানুল কুরআন'

পত্রিকায় ধারাবহিকভাবে সেইসব প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকি, যেগুলো 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ' প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড এবং 'ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।[৪] এসব প্রবন্ধে আমরা মুসলমানদের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টির চেষ্টা করেছি, তারা যদি এক জাতিত্বের নীতিমালা স্বীকার করে নিয়ে ধর্মহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকে গ্রহণ করে নেয়, তবে এর অর্থ হবে আত্মহত্যা করা।

আমরা একথা দাবী করছিনে যে, ঐ তিন বছরে মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেসী মতবাদের হ্রাস এবং নিজেদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অনুভূতির যা কিছুই উন্নতি হয়েছে, তা আমাদের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। কিন্তু একথা সম্ভবত আমাদের কোনো বিরোধীও সততার সাথে অস্বীকার করতে পারবেনা যে, এই ফলশ্রুতি প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টারও ভূমিকা রয়েছে।

ইসলামী জীবনব্যবস্থার জন্যে আন্দোলনের আহবান

অতপর মুসলমানদের জন্যে এই প্রশ্নের সমাধানের প্রয়োজন ছিল, দেশের রাজনৈতিক বিবর্তন তাদেরকে যে জটিলতায় নিমজ্জিত করেছে, তা থেকে তারা কিভাবে বেরিয়ে আসবে? কংগ্রেসী মুসলমানদের দৃষ্টিভংগী এ পর্যায়ে এসে আর মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য থাকেনি। এসময় তারা একথাও বুঝাতে সক্ষম হয় যে, একজাতীয়তার আদর্শের ভিত্তিতে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, তাতে 'শাসনতান্ত্রিক রক্ষা কবচ' তাদের কোনো কাজে আসতে পারেনা। কিন্তু এখন এই জটিলতার সমাধান কি? এছিল এক কঠিন দুশ্চিন্তাকর প্রশ্ন! একদল প্রস্তাব করলো, দেশ বিভক্তির দাবী করতে হবে এবং ভারত থেকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো পৃথক করে নিতে হবে। কিন্তু বিরাট সংখ্যক লোক এই প্রস্তাবে দ্বিধা সংশয়ে পড়ে যান। এমনকি স্বয়ং মিঃ জিন্নাহ্রও প্রথম প্রথম এ প্রস্তাবে দ্বিধা সংকোচ ছিল। এই দ্বিধা সংকোচের কারণ এটাই ছিল যে, এ প্রস্তাব কেবল জাতির অর্ধেক লোকের সমস্যার সমাধান করে। বাকী অর্ধেক থাকবে গোটা হিন্দুস্থানব্যাপী দুর্বল সংখ্যালঘু হিসেবে বিক্ষিপ্ত। এরা পুরোপুরি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের করুণার পাত্র হয়ে পড়ে থাকবে। এসময় ১৯৩৯ সালে আমরা আরেকটি ধারাবহিক নিবন্ধমালা লিখতে শুরু করলাম। ১৯৪০ সালে এটি 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ' ৩য় খন্ড নামে প্রকাশ হয়।[৫]

---

৪. এই গ্রন্থগুলো 'উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান' নামে বাংলাভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদক।

৫. এ গ্রন্থটিও 'উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান' গ্রন্থের অন্তর্ভূক্তি হয়েছে। অনুবাদক।

আমরা মুসলমানদের সামনে এ ধারণা পেশ করেছি, আপনারা এখন নিজেদেরকে যে জটিলতায় নিমজ্জিত দেখছেন, তার কারণ, আপনারা মুসলমানদেরকে কেবল একটি জাতিই মনে করে নিয়েছেন। আর একটি জাতি হবার কারণে আপনারা মনে করছেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আপনাদের শক্তি সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। ফলে আপনারা দ্বিগুণ সমস্যায় ফেঁসে গেছেন। যদি ভারতবর্ষ একটি দেশ থাকে, তবে গোটা জাতি নিঃশেষ হয়ে যায়। আর যদি দেশ বিভক্ত হয়, তবে অর্ধেক জাতি বিলীন হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে আপনারা কেবল একটি জাতিই নন, বরঞ্চ আপনারা একটি আদর্শিক দল। জার্মান, ফ্রান্স এবং ইংরেজদের মতো কোনো জাতি আপনারা নন। বরঞ্চ আপনারা একটি আদর্শিক দল (যেমন সমাজতন্ত্রীরা এবং কমিউনিস্টরা আদর্শিক দল)। বিগত শতাব্দীগুলোতে আপনারা আপনাদের আদর্শিক শক্তি দিয়ে দেশের পর দেশ জয় করেছেন। এই ভারতবর্ষেও যে কোটি কোটি মুসলমান দেখতে পাচ্ছেন, এই আদর্শই তাদের বিমুগ্ধ করেছিল। সুতরাং আপনারা যদি জাতীয় অধিকার এবং জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে আপনাদের আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থার জন্যে চেষ্টা সংগ্রাম শুরু করেন, তবে এর ফলে আপনাদেরকে কেবল যে ভারতবর্ষ থেকে মিটিয়ে দেয়াই সম্ভব হবে না তা নয়, বরঞ্চ আগামী কয়েক বছরের মধ্যে গোটা ভারতবর্ষ দারুল ইসলামে পরিণত হবার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, ভারতবর্ষের অন্য কোনো জাতি বা দলের নিকট এমন জীবন্ত আদর্শ নেই, যেমনটি ইসলাম আপনাদের দিয়েছে।

আমি আমার গোটা শক্তি দিয়ে এ ধারণা প্রচার করেছি এবং চেষ্টা করেছি মুসলমানরা যেন তা গ্রহণ করে। কিন্তু আমার এই চিন্তা জাতির বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট আবেদন সৃষ্টি করেনি। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ তাদের সেই বিখ্যাত প্রস্তাব পাশ করে, যাতে পাকিস্তান লাভ করাকে মুসলমানদের জাতীয় উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৪১ সাল আসতে না আসতেই একথা পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে গেলো, মুসলমানরা একটি জাতি হিসেবে এ প্রস্তাবকে নিজেদের আসল উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে।

দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক প্রশ্ন

এসময় আমাদের সামনে এমন দুটি গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক প্রশ্ন ছিল, যেগুলো চিন্তা ভাবনা করে দেখার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

এর একটি ছিল এই যে, দেশ বিভাগের জন্যে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করার পর খোদা না করুন, মুসলমানরা যদি সে প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়, তবে এই 'জাতীয় পরাজয়ের' প্রভাব ও পরিণতি থেকে ইসলাম, ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি ও মুসলমানদের ইসলামী স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করার উপায় কি হবে?

দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল, যদি দেশ বিভক্ত হয়, তবে ভারতের বিরাট অংশে যে কোটি কোটি মুসলমান থেকে যাবে, তাদের মধ্যে ইসলামের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার এবং ইসলামের আলো বিতরণ করার পদ্ধতি কি হবে? তাছাড়া যে চরিত্রের লোকেরা পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে, যদি তাদের নেতৃত্বেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়, সে অবস্থায় তাকে তুরস্কের মতো একটি ধর্মহীন রাষ্ট্র হওয়া থেকে রক্ষা করার এবং প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র বানাবার জন্যে কি ধরনের প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে?

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা

আমাদের কাছে প্রশ্ন দুটি এতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, আমাদের দৃষ্টিতে উপমহাদেশে ইসলামের ভবিষ্যত প্রশ্ন দুটির সঠিক সমাধানের উপর নির্ভরশীল ছিল। আমরা মাসের পর মাস এগুলোর সমাধান প্রসংগে চিন্তা ভাবনা করি। অবশেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাইঃ এখন ঐ সমস্ত লোকদের সংগঠিত করার সময় উপস্থিত, যারা বিগত নয় বছরে আমাদের দাওয়াত ও আহ্বান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সুতরাং ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে ঐ লোকদের একত্র করা হয় এবং 'জামায়াতে ইসলামীর' ভিত্তি স্থাপন করা হয়। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই এ সংগঠন প্রতিষ্ঠার পিছে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, এমন একদল সুশৃংখল ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক তৈরী করার কাজে হাত দেয়া, যারা এই উপমহাদেশে ইসলামকে বিজয়ী করার জন্যে কাজ করার ক্ষেত্রে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। খোদা না করুন, মুসলমানরা যদি দেশ বিভাগের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন এই দলটি সেই ব্যর্থতার ভয়ানক পরিণতির মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুত থাকবে। পক্ষান্তরে দেশ যদি বিভক্ত হয়, তবে সেক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশে এই দলটি ইসলামের পতাকা উড্ডয়ন করার জন্যে প্রস্তুত থাকবে।

এভাবেই আমাদের এই দাওয়াত দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রবেশ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সংগঠন ও প্রশিক্ষণ

ইসলামী আন্দোলনের পয়লা অধ্যায়ে কি কি কাজ করা হয়েছে এবং তা কিভাবে করা হয়েছে, অতপর কিভাবে কি পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে, প্রথম অধ্যায়ে আমরা তার বিশ্লেষণ পেশ করেছি। আপনি যদি সে আলোচনা মনোযোগের সাথে পড়ে থাকেন, তবে আপনার কাছে দুটি কথা স্পষ্ট হয়েছেঃ

এক. মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব লাভের উদ্দেশ্য

প্রথমেই যে জিনিসটি আপনার কাছে স্পষ্ট হবার কথা তা হলো, পয়লা দিন থেকেই এমন একটি সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, যা নিরেট ইসলামী আদর্শের আহবান নিয়ে উত্থিত হবে এবং ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম চালাবে। আমাদের মতে, এটাই ছিল মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব লাভের উদ্দেশ্য। আমাদের মূল্যায়নে পৃথিবীর সমস্ত ভাংগন ও বিকৃতি, বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের অধপতন এবং এই উপমহাদেশে মুসলমানদের জাতীয় সমস্যাবলীর মূল কারণ একটিই। আর তা হলো, তারা সেই মূল কাজটিই ছেড়ে বসেছে, প্রকৃতপক্ষে যে কাজের উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে আমরা কোনো পৃথক দল তৈরী করতে চাইছিলামনা। বরঞ্চ আমাদের কামনা ছিল, মুসলমানদের মধ্যে এই জিনিসটির সঠিক অনুভূতি সৃষ্টি হোক। প্রথমে তারা নিজেরা ইসলামকে বুঝুক। তারপর ইসলাম সম্পর্কে নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য জেনে নিক। অতপর জাতীয়ভাবে অন্য সকল ব্যস্ততা ত্যাগ করে নিজেদের সমস্ত শক্তি সামর্থ, ইচ্ছা আকাংখা ও দৃষ্টিকে নিজেদের দীনের দাওয়াত ও প্রতিষ্ঠার কাজে কেন্দ্রীভূত করুক। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই একটি মাত্র পন্থায়ই মুসলমানরা তাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে পারবে। শুধু তাই নয়, বরঞ্চ গোটা বিশ্বের সকল সমস্যার সমাধার পেশ করে বিশ্ব জাতিসমূহের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হবে।

দুই. জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার কারণ

দ্বিতীয় যে জিনিসটি আপনার কাছে পরিষ্কার হওয়ার কথা, তা হলো, আমরা তখনই জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করি, যখন আমাদের নয় বছরের অবিরাম প্রচার ও পরামর্শ সত্ত্বেও জাতি হিসেবে মুসলমানরা আমাদের উপস্থাপিত পথ অবলম্বন করেনি। যখন মুসলমানদের সমকালীন দলগুলো এটাকে নিজেদের সামষ্টিক চেষ্টা সংগ্রামের পথ হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। যখন ভারত বিভক্তি মুসলমানদের জাতীয় পলিসির রূপলাভ করে। যার ফলশ্রুতিতে অবশ্যাম্ভাবীরূপে অর্ধেক মুসলমানকে বন্ধক হিসেবে হিন্দু জাতি

পূজারীদের হাতে ন্যস্ত করে দিতে হতো। আর বাকী অর্ধেক মুসলমান এমন একটি 'জাতীয় রাষ্ট্র' লাভ করতো, যা একটি নিরেট ইসলামী রাষ্ট্রে পরিবর্তিত হওয়া (কমপক্ষে তার প্রতিষ্ঠাতা এবং নেতাদের চরিত্র ও আচরণ দেখে) খুবই জটিল মনে হচ্ছিল। এমতাবস্থায় আমরা ঐ মুষ্টিমেয় মুসলমানকে যথাশীঘ্র সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ দান করা জরুরী মনে করি, যারা আমাদের দাওয়াত বুঝে তা গ্রহণ করেছিল। যাতে করে এমন একদল লোক তৈরী হয়ে যায়, যারা একদিকে জাতীয় স্বার্থ চিন্তার উর্ধ্বে উঠে নিরেট দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে সক্ষম হবে। অপরদিকে ঐসব অবস্থার মুকাবেলা করতে সক্ষম হবে, যা ভারত বিভক্তির আন্দোলনের ফলে সামনে আসছিল বলে মনে হচ্ছিল।

এই দ্বিতীয় অধ্যায়টিকে আমরা সংগঠন ও প্রশিক্ষণের অধ্যায় বলে আখ্যায়িত করি।

বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করার তাৎপর্য

কিন্তু, প্রথমেই একথা বুঝে নেয়া দরকার, কোনো আন্দোলনকে বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করার অর্থ এই নয় যে, একটি অধ্যায়ের পর আরেকটি অধ্যায় শুরু হলে প্রথম অধ্যায়ের কাজ শেষ হয়ে যায় এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে সে কাজ আর জারি থাকেনা। বরঞ্চ এর অর্থ হলো, পরবর্তী অধ্যায়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের কাজ জারি রেখেই কিছু অধিক কাজ বা কর্মসূচী হাতে নেয়া। জামায়াত গঠনের পর সংগঠন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আরম্ভ করার সাথে সাথে আমরা সামালোচনা ও পরিগঠন এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকে ঠিক সেভাবেই অবিচ্ছিন্নভাবে জারি রাখি, যেভাবে তা প্রথম অধ্যায় থেকেই চলে আসছিল। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেসব বই পুস্তক প্রকাশ করা হয় সেগুলো যদি পাঠকগণ সন তারিখের ধারাবহিকতার ভিত্তিতে পড়ে দেখেন, তবে তাদের পক্ষে সেই চিত্রকে বুঝে নেয়া খুবই সহজ হবে, যে অনুযায়ী আমরা এই আন্দোলনকে অগ্রসর করছিলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১৯৪২—৪৭ সালঃ (১) রাসায়েল ও মাসায়েলের অধিকাংশ প্রবন্ধ (২) তাফহীমুল কুরআনের সূচনা।

১৯৪২ সালঃ (৩) শান্তিপথ।

১৯৪৩ সালঃ (৪) একমাত্র ধর্ম (৫) ইসলামী আইনে মুরতাদে শাস্তি।

১৯৪৪ সালঃ (৬) ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ (৭) শিরকের হাকীকত।

১৯৪৫ সালঃ (৮) তাওহীদের হাকীকত (৯) সমাজতন্ত্র ও ইসলাম।

১৯৪৬ সালঃ (১০) সত্যের সাক্ষ্য (১১) ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি।

১৯৪৭ সালঃ (১২) জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত (১৩) ভাঙ্গা গড়া (১৪) তাকওয়ার হাকীকত।

এই বইগুলো অধ্যয়ন করলে একথা ভালভাবেই পরিষ্কার হবে যে, এই অধ্যায়ে ইসলামের মৌলিক দাওয়াত এবং তার বাস্তব রূপ কাঠামোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কাজ প্রথম অধ্যায় থেকেও কিছুটা ব্যাপকতরভাবে সম্পাদন করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি নাগাদ দেশের শিক্ষিত নাগরিকদের জন্যে এতোটা ব্যাপক সাহিত্যের যোগান দেয়া হয়েছে যার মধ্যে তারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রায় সকল দিক ও বিভাগের বাস্তব রূপ সহজবোধ্যভাবে দেখতে পারতো। জামায়াতের সাংগঠনিক ও প্রশিক্ষণের কাজ ছিল এর অতিরিক্ত। অবস্থা এমন ছিলনা যে, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ বাদ দিয়ে এ অধ্যায়ে কেবল জামায়াতের প্রস্তুতিমূলক কাজেই গোটা সময় ব্যয় করা হয়েছে।

জামায়াত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

এবার আমরা আর একটু বিস্তৃতভাবে বলতে চাই, জামায়াত প্রতিষ্ঠাকালে আমাদের সামনে কি উদ্দেশ্য ছিল? আমরা কি ধরনের লোক তৈরী করতে চেয়েছিলাম? আর কি কাজই বা তাদের দ্বারা সম্পাদন করতে চেয়েছিলাম? বিষয়টি বুঝবার জন্যে আজ কোনো নতুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করার পরিবর্তে সেই পুরোনো বাক্যগুলোই এখানে উল্লেখ করে দেয়া সমুচিত বলে মনে করি, যেগুলোতে প্রথমদিকেই জামায়াত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে।

জামায়াত গঠনের চারমাস আগে ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে 'তর্জমানুল কুরআন' পত্রিকায় একটি নিবন্ধ লেখা হয়েছিল। 'একটি সত্যনিষ্ঠ দলের প্রয়োজন' শিরোনামের এই নিবন্ধটি আমাদের 'উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে গ্রন্থাবদ্ধ করে নেয়া হয়েছে। এই নিবন্ধে শির্ক, বৈরাগ্যবাদ ও পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতার ব্যর্থতার পর এখন বিশ্বের ভবিষ্যত কেবল একটি মতাদর্শের সাথেই সম্পর্কিত হয়ে আছে, আর সেই মতাদর্শ হচ্ছে ইসলাম। একথাগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করার পর বলা হয়েছিলঃ

আদর্শ প্রতিষ্ঠাকামী দলের কর্মীদের গুণাবলী

"কিন্তু তাই বলে একথা ভেবে নেয়া ঠিক হবে না যে, পৃথিবী ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে, কেবল ইসলামের গুণাবলী বর্ণনা করে ইসলামের উপর ঈমান আনার জন্যে একটা দাওয়াতনামা প্রচার করতে পারলেই এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও

আমেরিকা একে একে তার বশ্যতা স্বীকার করতে শুরু করবে। তাই বিশ্ববাসীকে ভবিষ্যত অন্ধকার যুগ থেকে বাচাঁতে ও ইসলামের অমূল্য রত্নে ভূষিত করতে হলে এ সুষ্ঠু ও নির্ভুল মতবাদটি হস্তগত হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরঞ্চ সেই সাথে তার প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি নিষ্ঠাবান ও সৎ মানবগোষ্ঠীর এগিয়ে আসাও প্রয়োজন। এজন্যে প্রয়োজন এমন একটি কর্মীবাহিনীর, যাদের ঐ মতাদর্শের উপর সাচ্চা ঈমান ও অবিচল আস্থা রয়েছে। তাদেরকে সবার আগে প্রমাণ করে দেখাতে হবে, ঐ মতাদর্শের প্রতি তাদের নিজেদের ঈমান কতখানি মজবুত। যে কর্তৃত্বকে তারা স্বীকার করে, আগে নিজেরাই তাঁর অনুগত ও ফরমাবরদার হবে। যে নিয়ম নীতিকে তারা সঠিক ও বিশুদ্ধ বলে বিশ্বাস ও প্রচার করছে, আগে নিজেরাই হবে তার যথার্থ অনুসারী। যে জিনিসকে তারা অবশ্য করণীয় বলে জেনেছে, প্রথমে নিজেরাই তা মেনে চলবে। যাকে তারা হারাম বা অবৈধ মনে করছে আগে নিজেরাই তা বর্জন করে চলবে। এভাবে ঐ আদর্শের প্রতি নিজেদের নিষ্ঠা আগে প্রমাণ করে দেখাতে না পারলে, তার উপর তাদের আস্থা আছে কিনা, সেটাই হয়ে পড়বে সন্দেহযুক্ত। তেমনটি হলে অন্যেরা তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করতে এগিয়ে আসতে চাইবেনা। কিন্তু শুধু এটুকুই যথেষ্ট নয়, এ পতনোম্মুখ সভ্যতা, সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার সাথে ও তার অনুসারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদও করতে হবে। এ ব্যবস্থার সাথে তাদের যে সুযোগ সুবিধা, স্বার্থ, আশা আকাংখা ও আরাম আয়েশ জড়িত রয়েছে, তাও পরিত্যাগ করতে হবে। এভাবে একটা প্রতিষ্ঠিত বিজয়ী সভ্যতার সাথে সংঘাত ও বিদ্রোহের অনিবার্য ফল হিসেবে যেসব ক্ষয়ক্ষতি, বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে, তাও ক্রমে ক্রমে বরদাশত করে নিতে হবে। একটা খারাপ ব্যবস্থার আধিপত্য উৎখাত করতে ও তার জায়গায় একটা সুষ্ঠু ও ভালো ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে যা যা করা দরকার অতপর তাও তাদের করতে হবে। এধরনের একটা বিপ্লবাত্মক কার্যক্রমে অংশ নিতে গিয়ে বহু মূল্যবান সম্পদ ও সময় ব্যয় করতে হবে। মস্তিষ্ক ও শরীরের সব রকমের শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। জেল যুলুম, নির্বাসন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং পরিবার পরিজনের জান মালের সর্বনাশ হওয়ার আশংকাও দেখা দেবে। এমনকি সময়ে প্রাণও দিতে হবে। এসব পথ অতিক্রম না করে পৃথিবীতে কোনো বিপ্লব কখনো সাধিত হয়নি, আজও হতে পারেনা। একটা সুষ্ঠু ও সুন্দর মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এরূপ নিবেদিত প্রাণ একদল লোক যতোক্ষণ না এগিয়ে আসবে,

সে মতবাদ যতোই উঁচু দরের হোক না কোন, বই কিতাবের পাতা থেকে নেমে সরাসরি মাটিতে শিকড় গেড়ে বসতে পারেনা। মতবাদের প্রতিষ্ঠার জন্যে তার আদর্শিক শক্তিমত্তা যতোখানি প্রয়োজন, উক্ত মতবাদে বিশ্বাসী মানুষগুলোর চরিত্রের বলিষ্ঠতা, কর্মউদ্দীপনা এবং ত্যাগ ও কুরবাণীর সমন্বিত শক্তিও ঠিক ততোখানি প্রয়োজন। জমিতে ফসল উৎপাদনের প্রক্রিয়া এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভালো ফসল উৎপাদনে সুষ্ঠু কৃষি পদ্ধতি, উত্তম বীজ, সামঞ্জস্যপূর্ণ আবহাওয়া এসবেরই যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু মাটি শুধু এতেই সন্তুষ্টু হয় না। সে এতোটা বাস্তববাদী যে, কৃষক যতোক্ষণ না মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অটুট ধৈর্য ও অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা তার ওপর নিজের অধিকার প্রমাণ করে, ততোক্ষণ সে তাকে সোনালী ফসলে পরিপূর্ণ মাঠের ডালি উপহার দিতে রাজী হয়না।"

জামায়াত গঠনের এক বছর পর ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে 'দারবাঙ্গা সম্মেলনে' যে বক্তব্য রাখা হয়েছিলো, তার কয়েকটি বাক্য নিম্নরূপঃ

নেতৃত্বের গুণাবলীর অধিকারী কর্মী

"আমাদের নিকট বাইরের তুলনায় ভিতরটা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। নিছক সংগঠন এবং নিছক একটি সীমিত কর্মসূচী দ্বারা মানুষকে পরিচালিত করলে এবং জনগণকে কোনো একটি দিকে লাগিয়ে দিলেই আমাদের কাজ শেষ হয়না। জনসাধারণের মধ্যে গণআন্দোলন (MASS MOVEMENT) চালাবার আগেই আমাদেরকে এমনসব লোক তৈরী করার চিন্তা করতে হবে, যারা হবেন উন্নততর ইসলামী চরিত্রের অধিকারী। যারা এমন উন্নত পর্যায়ের বিবেক বুদ্ধি রাখবেন, যার ফলে চিন্তার পরিগঠনের সাথে সাথে তারা সামাজিক নেতৃত্বের দায়িত্বও পালন করতে সক্ষম হবেন। এজন্যেই সাধারণের মধ্যে আন্দোলনকে পরিচিত করবার জন্যে আমি তাড়াহুড়া করছিনা। বরং এখন আমার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা হলো দেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোকদেরকে প্রভাবিত করা, তাদেরকে নাড়া দিয়ে তাদের মধ্য থেকে অধিকতর সৎ লোকদের বাছাই করার চেষ্টা করা, পরবর্তীকালে যারা জনগণকে নেতৃত্ব দিতে এবং একটি নতুন সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।----এ অভিযোগ ঠিক যে, ব্যাপক সংখ্যক জনসাধারণকে এ চিত্রানুযায়ী উন্নত চরিত্রের অধিকারী বানানোর জন্যে দীর্ঘ সময় দরকার। কিন্তু গণসংশোধনের অপেক্ষায় আমরা আমাদের বিপ্লবের কর্মসূচীকে মুলতবী করতে চাইনা। আমাদের সামনে যে কাজ রয়েছে তার রূপরেখা হলো, জনগণের নেতৃত্ব দানের জন্যে এমন একটি সংক্ষিপ্ত দল তৈরী

করতে হবে, যার প্রতিটি সদস্য নিজেদের উন্নত নৈতিক চরিত্রের প্রভাবে জনগণকে আকৃষ্ট করে নিতে সক্ষম হবে। ----- যাতে করে এই কেন্দ্রীয় ব্যক্তিগুলোর মাধ্যমে জনগণের সার্বিক শক্তি সামর্থ ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হয়ে ইসলামী বিপ্লবের পথে কাজে লাগে। -এই হচ্ছে একটি পূর্ণাংগ, স্থিতিশীল ও সর্বব্যাপী বিপ্লবের অপরিহার্য প্রাথমিক অধ্যায়।[৬]

১৯৪৪ ইং সালে দারুল ইসলাম সম্মেলনে যে বক্তৃতা করা হয়েছিল, তার নিম্নোক্ত বাক্যগুলোও প্রণিধানযোগ্যঃ

প্রথমে আত্মসংশোধন

"এবার আমি সংক্ষেপে আপনাদের বলবো ইসলামী কর্মীদের মধ্যে সর্বনিম্ন কি কি প্রয়োজনীয় গুণাবলী থাকা উচিত? --- বাইরের জগতে খোদাদ্রোহীদের মোকাবিলা করার আগে আপনি সেই বিদ্রোহীকে অনুগত করুন, যে আপনার ভিতরে অবস্থান করছে এবং খোদার আইন ও তার সন্তুষ্টির বিপক্ষে চলার জন্যে অবিরাম দাবী করতে থাকে। যদি এ বিদ্রোহী আপনার ভিতরে লালিত হতে থাকে এবং আপনার উপর এতোটা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করে, যার ফলে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার কাছ থেকে সে নিজের দাবী আদায় করতে সক্ষম হয়, তবে বাইরের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আপনার যুদ্ধ ঘোষণা একটা অর্থহীন ব্যাপারে পরিণত হবে।---- নবী করিমের (সা) হাদীস অনুযায়ী নিজেকে ঐ ঘোড়ার মতো করে তৈরী করুন, যাকে একটি খুঁটায় বেঁধে রাখা হয়েছে এবং চারদিকে যতোই চলাফেরা করুক না কেন তার দড়ি তাকে যতোদূর যেতে দেয় সে কেবল ততোদূরই যেতে পারে। এর সীমা অতিক্রম করার ক্ষমতা তার নেই। এহেন ঘোড়ার অবস্থা বল্গাহীন ঘোড়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। বল্গাহীন ঘোড়া প্রত্যেক ময়দানে ঘুরে বেড়ায়, প্রতিটি ক্ষেতে প্রবেশ করে। যেখানে সবুজ ঘাস দেখে সেখানেই একেবারে অধৈর্য হয়ে লাফিয়ে পড়ে। বল্গাহীন ঘোড়ার চালচলন ও অবস্থা আপনারা নিজেদের মধ্যে থেকে দূরে নিক্ষেপ করুন এবং খুঁটায় বেঁধে রাখা ঘোড়ার অবস্থা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করুন।"[৭]

---

৬. 'জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী', ১ম খন্ড, পৃঃ ৯১-৯২, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ১৯৫৮ইং।

৭. জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৮-৩০, চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৬২ ইং।

দাওয়াতের মূর্তিমান নমুনা

"ব্যক্তি বা দল হিসেবে আপনি নিজের আদর্শ ও লক্ষ্যকে এতো বেশী ভালোবাসুন এবং নিজের নীতি নিয়মের এতো বেশী অনুগত হয়ে পড়ুন যে, আপনার আশেপাশে যেসব লোক কোনো আদর্শ ও লক্ষ্য ছাড়া নীতিহীন জীবন যাপন করছে তারা যেন আপনার নিয়মানুগ জীবন যাত্রাকে বরদাশত করতে না পারে। ------------ কিন্তু আমি একথা পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, এ সংঘর্ষ ঠিক সেই মানসিকতার সংগে চালানো উচিত, যে মানসিকতা নিয়ে একজন ডাক্তার রোগীর সাথে সংঘর্ষ বাধায়। আসলে তিনি রোগীর সাথে লড়াই করেন না, লড়াই করেন রোগের সাথে। তার সমস্ত প্রচেষ্টা হয় সহানুভূতিপূর্ণ। তিনি যদি রোগীকে তিতা ঔষধ পান করান কিংবা তার শরীরে অস্ত্রপচার করেন, তাহলেও এ হয় পুরোপুরি আন্তরিকতা প্রসূত, শত্রুতা প্রসূত নয়। তার ঘৃণা অথবা রাগ সবটুকুই হয় রোগের বিরুদ্ধে রোগীর বিরুদ্ধে নয়।"[৮]

নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করার অভ্যাস গড়া

"আমাদের অবিরাম প্রচেষ্টা চালাবার এবং নিয়মতান্ত্রিক (SYSTEMATIC) পদ্ধতিতে কাজ করার অভ্যাস থাকতে হবে। সুদীর্ঘকাল থেকে আমাদের জাতি এতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে, কেনো কাজ করতে হলে সব চাইতে কম সময়ের মধ্যে করতে হবে এবং কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হলে অবশ্যি হৈ চৈ করতে হবে। তাতে দুএক মাসের মধ্যে সমস্ত কর্ম পণ্ড হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই। আমাদের এ অভ্যাস বদলাতে হবে। এর পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে এবং হৈ হুল্লোড় না করেই কাজ সম্পাদন করার নক্শা তৈরী করতে হবে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদনের ভারও যদি আপনার উপর দেয়া হয়, তাহলে কোনো বড় রকমের এবং ত্বরিত ফল লাভের আশা ছাড়াই এবং কোনো বাহ্‌বার প্রত্যাশা না করেই আপনি ধৈর্যের সংগে নিজের সমগ্র জীবন এর পিছনে লাগিয়ে দিন। খোদার পথে জিহাদে সবসময় জোয়ার আসে না। আর প্রত্যেক ব্যক্তিও প্রথম সারিতে লড়াই করতে পারে না। একেক সময়ের লড়াইয়ের জন্যে কখনো কখনো পঁচিশ পঞ্চাশ বছর ধরে ময়দান তৈরী করতে হয়। আর প্রথম সারিতে যদি কয়েক হাজার ব্যক্তি লড়াই করে তাহলে পেছনের সারিগুলোর লক্ষ লক্ষ লোককে লড়াইয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় ছোটখাটো কাজে ব্যাপৃত থাকতে হয়, যা বাহ্য

---

৮. জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী ২য় খন্ড পৃঃ ২৮-৩০ ৪র্থ মুদ্রণ ১৯৬২ ইং।

দৃষ্টিতে অত্যন্ত তুচ্ছ বলে মনে হয়।"[৯]

১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোর সম্মেলনে যে বক্তৃতা করা হয়েছিল, তার কয়েকটি অংশ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করতে পারেঃ

একই রং এ রঞ্জিত মুমিন ও মুসলিম

"প্রত্যেক মুমিনের কাছে আমাদের দাবী হলো, তিনি যেন প্রকৃত মুসলিম হন, একনিষ্ঠ হন, একই রংএ রঞ্জিত মুমিন ও মুসলিম হন, এমন সকল জিনিসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন (ছিন্ন করতে না পারলে ছিন্ন করবার জন্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা সংগ্রাম চালিয়ে যান), যা ঈমানের বিপরীত ও মুসলমানোচিত জীবন পদ্ধতির সাথে অসামঞ্জস্যশীল এবং তিনি যেন ঈমানের প্রত্যেকটি দাবীকে ভালাভাবে বুঝে নেন ও তা পূর্ণ করার জন্যে অবিরাম চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যান।"[১০]

উচ্চতর গুণাবলী ও কর্মসম্পাদনের যোগ্যতা

"আমাদের আহ্বান কেবল এতোটুকুই নয় যে, বিশ্বের ক্ষমতার বাগডোর ফাসিক ফাজিরদের হাত থেকে বের হয়ে সৎ মুমিনদের হাতে আসুক। বরঞ্চ ইতিবাচকভাবে আমাদের আহ্বান হচ্ছে, ঈমানদার ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের এমন একটি দল সুসংগঠিত করা, যারা কেবল পাকা মুমিনই হবেনা, কেবল নিষ্ঠাবান মুসলিমই হবেনা, কেবল সৎ ও পবিত্র নৈতিক চরিত্রের অধিকারীই হবেনা, বরঞ্চ সেই সাথে ঐ সকল গুণাবলী ও যোগ্যতার অধিকারীও হবে, যা বিশ্বব্যবস্থাকে সর্বোত্তম পন্থায় পরিচালনার জন্যে অপরিহার্য। আর তারা এগুলোর কেবল অধিকারীই হবেনা, বরঞ্চ এসব গুণাবলী ও যোগ্যতার দিক থেকে নিজেদেরকে সমকালীন বিশ্বের নেতা ও কর্মীদের তুলনায় উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর প্রমাণ করবে।"[১১]

---

৯. জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী ২য় খন্ড পৃঃ ২৮-৩০ ৪র্থ মুদ্রণ ১৯৬২ ইং।

১০. 'দাওয়াতে ইসলামী আওর উসকে মুতালিবাত' পৃঃ ২৩-২৪ ৫ম সংস্করণ ১৯৫৬

১১. 'দাওয়াতে ইসলামী আওর উসকে মুতালিবাত' পৃঃ ২৩-২৪ ৫ম সংস্করণ ১৯৫৬

সত্যপন্থী লোকদের সংগঠিত করা

"আমরা আসলে এমন একদল লোক তৈরী করতে চাই, যারা একদিকে যেমন প্রচলিত মুত্তাকীদের চাইতে অধিকতর খোদাভীরু হবে, তেমনি অপরদিকে বিশ্বপরিচালনার ক্ষেত্রে সাধারণ দুনিয়াদারদের চাইতে হবে অধিকতর যোগ্যতার অধিকারী। আমাদের মতে, দুনিয়ার সকল অনিষ্টের কারণ হলো, নেক্কার লোকেরা নেকীর সঠিক অর্থ না বুঝার কারণে দুনিয়ার সকল কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে দুনিয়া পরিচালনার যাবতীয় কার্যক্রম এমন অসৎ লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, যারা কখনো নেকীর নাম মুখে উচ্চারণ করলেও খোদার সৃষ্টিকে ধোঁকা দেয়ার জন্যেই করে। এই অনিষ্ট ও অধপতনের চিকিৎসা ও সংশোধনের পথ একটিই আছে। আর তা হলো, সৎ ও সত্যনিষ্ঠ লোকদের একটি দল সংগঠিত করতে হবে। যারা হবে খোদভীরু, সত্যপন্থী, বিশ্বস্ত এবং আল্লাহর পছন্দনীয় নৈতিক এবং চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী। সেই সাথে,তারা পার্থিব বিষয়াদি দুনিয়াদার লোকদের চাইতেও ভালভাবে বুঝবে এবং বিশ্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্য দ্বারা স্বয়ং দুনিয়াদার লোকদেরকেই পরাস্ত করে ছাড়বে। আমাদের মতে, সৎ ও সত্যনিষ্ঠ লোকদের সংগঠিত করার চাইতে বড় কোনো রাজনৈতিক কাজ হতে পারেনা এবং এর চাইতে অধিকতর সফল কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনও হতে পারেনা। দুশ্চরিত্র ও দুর্নীতিবাজ লোকদের পক্ষে পৃথিবীর চারণভূমিতে কেবল ততোক্ষণ পর্যন্তই চরে বেড়াবার অবকাশ রয়েছে, যতোক্ষণ না সত্যনিষ্ঠ লোকদের এমন একটি দুর্জয় দুর্দান্ত দল তৈরী হবে। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন, যখনই এমন একটি দল তৈরী হয়ে যাবে, তখন কেবল আপনাদের এই দেশেরই নয়, বরঞ্চ পর্যায়ক্রমে গোটা বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি, ধনসম্পত্তি, শিক্ষা সংস্কৃতি এবং বিচার ও ইনসাফের বাগডোর তারই মুষ্ঠিবদ্ধে এসে যাবে। ফাসেক ফাজেরদের সমস্ত শক্তি ও প্রতাপের বাতি তখন পৃথিবী থেকে নিভে যাবে। এই বিপ্লব কিভাবে সংঘটিত হবে সে কথা আমি বলতে পারবোনা। কিন্তু আগামী কাল যে সূর্যোদয় হবে, সে কথা আমি যেভাবে বিশ্বাস করি, ঠিক সেভাবেই আমি বিশ্বাস করি যে, এ বিপ্লবও অবশ্যি সংঘটিত হবে। তবে এর পূর্বশর্ত হচ্ছে, সৎ, যোগ্য ও সত্যনিষ্ঠ লোকদের এমন একটি সুসংগঠিত দল তৈরী করার ব্যাপারে আমাদেরকে সাফল্য অর্জন করতে হবে।"[১২]

---

১২. প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৫২-৫৩।

ভারত বিভাগের ৩ মাস আগে ১৯৪৭ সালের মে মাসে সাবেক কেন্দ্রে জামায়াতে ইসলামীর এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সম্মেলনের বক্তব্যে দেশের সাধারণ নৈতিক বিকৃতি এবং তার ভয়াবহ পরিণতির কথা আলোচনা করার পর আমি বলেছিলামঃ

সৎ লোকদের সন্ধান করা ও সংগঠিত করা

"এই অন্ধকারে আমাদের জন্যে আশার একটি মাত্র আলোক রেখা দেখা যাচ্ছে। সেটা হলো, আমাদের দেশের সমস্ত অধিবাসীই বিকৃত স্বভাব হয়ে যায়নি। অন্তত, শতকরা চার পাঁচ জন লোক বর্তমান নৈতিক অধঃপতন থেকে বেঁচে আছে। এই পুঁজি নিয়ে সংস্কার ও সংশোধনের কাজ শুরু করা যেতে পারে। এই সৎ লোকগুলোকে খুঁজে বের করে সংঘবদ্ধ করাই হবে সংস্কারের পথে প্রথম পদক্ষেপ।

আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হলো এই যে, এখানে অসৎরা বেশ সংঘবদ্ধভাবে রীতিমত কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু সৎ/সংঘবদ্ধ নয়। সৎলোক আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তারা বিক্ষিপ্ত।......... এখন এ অবস্থার পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত। আমরা যদি আমাদের দেশের উপর খোদার আজাব প্রত্যাশা না করি এবং প্রত্যাশা না করি যে, এ আজাবের মুখে দেশের সৎ ও অসৎ সমস্ত লোক নিক্ষিপ্ত হোক, তাহলে আমাদের মধ্যকার যে সমস্ত সৎ লোক এখনো এ নৈতিক ব্যাধি মুক্ত রয়েছে, তাদেরকে একত্রিত ও সংঘদ্ধ করার চেষ্ট করা আমাদের কর্তব্য। যে ক্রমবর্ধমান অন্যায় ও ফেতনা ফাসাদ আমাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে এ সংঘবদ্ধ সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে আমাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

বর্তমানে এই সৎলোকগণ বাহ্যত অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক সংখ্যালঘুতে রয়েছে দেখে আপনারা ঘাবড়াবেননা। এ মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক যদি সংঘবদ্ধ হয়ে যায়, এদের নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন খাঁটি, সত্য ও সততা, ইনসাফ, আন্তরিকতা, সৎনীতি ও নৈতিকতার ওপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জীবনের যাবতীয় সমস্যার একটি উৎকৃষ্ট সমাধান ও দুনিয়ার সমস্ত কাজ কারবার সঠিক পন্থায় পরিচালনা করার জন্য একটা সুষ্ঠু কর্মসূচী এরা গ্রহণ করতে পারে, তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখুন, এভাবে সৎ লোকেরা সংঘবদ্ধ ও সুশৃংখল হয়ে সংগ্রাম করতে থাকলে তাদের শক্তির সামনে সংঘবদ্ধ অসৎ শক্তি বহু জনবল এবং পৈশাচিক অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য সত্ত্বেও পরাজিত হতে বাধ্য হবে। মানুষের প্রকৃতি অসৎ নয়। তাকে অবশ্যি ধোঁকা দেয়া যেতে পারে এবং অনেকটা

বিকৃতও করা যেতে পারে। কিন্তু তার ভেতর সততা ও কল্যাণের যে মূল্যবোধ খোদা আমানত রেখেছেন তাকে একেবারে খতম করা সম্ভব নয়--------। ভালোর ধারকগণ কর্মক্ষেত্রে না থাকলে এবং তাদের পক্ষ থেকে সাধারণ লোকদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা চালানো না হলে মন্দের ধারকদের হাতেই সমস্ত কর্তৃত্ব থাকবে এবং তারা সাধারণ লোকদেরকে নিজেদের পথে টেনে নিয়ে যাবে। কিন্তু যদি ভালোর ধারকরা কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসে এবং সংশোধনের যথাযোগ্য চেষ্টায় ত্রুটি না করে, তাহলে সাধারণ লোকের ওপর মন্দের ধারকদের প্রভাব বেশী দিন থাকতে পারেনা। কারণ শেষ পর্যন্ত নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রেই এ উভয় দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। সেখানে অসৎ লোকেরা সৎলোকদেরকে কখনো পরাজিত করতে পারবে না। সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যা, বিশ্বস্ততার মোকাবিলায় বিশ্বাসঘাতকতা এবং পবিত্রতার মোকাবিলায় পৈশাচিকতা ও দুষ্কর্ম যতই জোরদার হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত সত্য, বিশ্বস্ততা এবং পবিত্রতার বিজয় সূচিত হয়। দুনিয়া অনুভূতিহীন নয় যে, সৎ চরিত্রের মাধুর্য এবং অসৎ চরিত্রের তিক্ততা আস্বাদন করার পরও পরিশেষে মাধুর্যের চেয়ে তিক্ততাকে ভালো বলে গ্রহণ করবে।"[১৩]

এই উদ্ধৃতিগুলো সবই জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক অধ্যায়ের লেখা ও বক্তৃতা থেকে নেয়া হয়েছে। কি উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং কর্মীদের সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ দানের এই ধারাবাহিকতা আরম্ভ করা হয়েছিল, তা এই উদ্ধৃতিগুলো থেকে পরিষ্কার হয়েছে। যারা আমাদের কাজকে আরো পরিষ্কারভাবে জানতে চান, তারা আমাদের প্রকাশিত নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো সন তারিখের ক্রমধারা অনুযায়ী পাঠ করুনঃ

১৯৩৯—৪০ সাল ঃ (১) মুসলমান ও সমকালীন রাজনৈতিক সংঘাত ৩য় খণ্ড।[১৪]

১৯৪১—৪৩ সাল ঃ (২) জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী ১ম খণ্ড।

১৯৪৪ সাল ঃ (৩) জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী ২য় খণ্ড।

১৯৪৫ সাল ঃ (৪) দাওয়াতে ইসলামী আওর উসকে মুতালেবাত (৫) ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি। (৬) জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী ৩য় খণ্ড।

---

১৩. ভাংগা ও গড়া, মূল উর্দু বই পৃঃ ৩১-৩৫।

১৪. এটি এখন উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান গ্রন্থের ২য় খণ্ডের অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।

১৯৪৭ সাল ঃ (৭) জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী ৫ম খণ্ড। (৮) ভারতবর্ষে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী।[১৫] (৯) জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত। (১০) ভাংগা ও গড়া।

এগুলো অধ্যয়ন করলে পাঠকগণ কেবল জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হবার উদ্দেশ্য সম্পর্কেই অবগত হবেননা, বরঞ্চ একথাও জানতে পারবেন যে, ১৯৪১ সালের আগস্ট থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পুরো ছয়টি বছর আমরা কি কাজে অতিবাহিত করেছি? আমাদের সংগঠন পদ্ধতি কি ছিল? আমাদের সংগঠনে আমরা কি ধরনের ডিসিপ্লিন প্রতিষ্ঠা করেছি? কী পন্থায় লোকদের ছাঁটাই বাছাই করেছি? কোন্ পন্থায় অকর্মন্য লোকদের ছাঁটাই করে পৃথক করেছি? কর্মঠ লোকদের প্রশিক্ষণের জন্যে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি? এবং আরো কি কি করতে চেয়েছি অথচ করতে পারিনি? – এসব কিছুই উপরোক্ত পুস্তকগুলোর আয়নায় সবিস্তারে দেখা যেতে পারে।

কেউ ইচ্ছে করলে জেনে বুঝে কিংবা না জেনে বুঝে এই গোটা কার্যক্রমকে বিদ্রুপ কিংবা অপবাদের ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু এটা আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি এমন কিছু বিধি বিধানের উপর এই বিশ্বব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন যে, এখানে ফুঁ দিয়ে পাহাড় উড়িয়ে দেয়া যায়না এবং মুখের কথায় সত্যকে বদলে দেয়া যায় না। আল্লাহর রাজ্যে এই অনিয়ম নেই যে, কৃষক নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ক্ষেতের ফসল পাকাবে আর অপর কেউ কেবল বদ দোয়া দিয়ে তা জ্বালিয়ে দেবে।

সংগঠন ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট লোকদের সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ দানের ক্রমধারা কী উদ্দেশ্যে আরম্ভ করা হয়েছিল, কি ধরনের লোকদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্য ছিল, তাদের কি ধরনের প্রশিক্ষণ দানের চিন্তা ছিল এবং তাদের দ্বারা কি কাজ সম্পাদন করা লক্ষ্য ছিল, তা সবিস্তারে পূর্বের পরিচ্ছেদে বলে এসেছি। জামায়াতের প্রাথমিক অধ্যায়ে প্রকাশিত বই পুস্তকের উদ্ধৃতি দিয়ে সে বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যাতে করে কেউ এই সন্দেহে নিমজ্জিত হতে না পারে যে, জামায়াতের প্রতিষ্ঠাকে সঠিক প্রমাণ করার জন্যে এখন নতুন করে তার উদ্দেশ্য রচনা করা হচ্ছে।

এই উদ্দেশ্যে সমাজের সৎ ও সত্যনিষ্ঠ লোকদের ছাঁটাই বাছাই করা এবং

---

১৫. এটি এখন উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান গ্রন্থের ১ম খণ্ডের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

তাদেরকে একটি নিয়মের অধীনে সুসংগঠিত করার কাজ ছিল এক বিরাট ধৈর্য ও অবিচলতার কাজ। একাজই সম্পাদন করা হচ্ছিল কয়েক বছর যাবত নীরবে এবং ধীর গতিতে। এসময় গোটা দেশের বিরাট সংখ্যক লোকের কাছে জামায়াতের সাহিত্য পৌছে। এর মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক এই বইগুলোকে ইসলামের সঠিক ভাষ্য মনে করেছেন। তাদের মধ্যে আবার হাজারো মানুষ এগুলোর দ্বারা কম বেশী প্রভাবিত হয়েছেন। তন্মধ্যে আবার শত শত লোকের অন্তর সাক্ষ্য দিয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে এটাই কর্তব্য কাজ। কিন্তু এই শত শত লোককেও আবার একই সময় জামায়াতের সদস্য করা সম্ভব হয়নি। সময় সময় কিছু কিছু লোক এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয় যে, এখন থেকে তাদের জীবন মরণ কেবলমাত্র বিশ্ব নিখিলের প্রভুর জন্যে। তারা মুখে যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন তাদের বাস্তব জীবনও সত্যিই তার সাক্ষ্য দেয় কিনা তা যাচাই করার জন্যে তাদের কথাকে তাদের আমল ও কর্ম দ্বারা পরখ করা হয়েছে। অনেক সময় এক এক ব্যক্তিকে মাসের পর মাস প্রার্থিতার ও পরীক্ষার মঞ্জিলে ফেলে রাখা হয়েছে। অতপর ভালভাবে আশ্বস্ত হয়ে যখন তাকে সদস্য হিসেবে জামায়াতে শামিল করে নেয়া হয়েছে, তারপরও গোটা জামায়াত দেখছিল, তার নৈতিক চরিত্র, আচার আচরণ, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আল্লাহর দীনের বিজয়ের জন্যে তার কর্মতৎপরতা সেই মান অনুযায়ী আছে কি না, যা কল্যাণের দিকে আহবানের খেদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্যে নুন্যতম প্রয়োজন। যেখানে কোনো ব্যক্তি কাংখিত মানের নীচে নেমে গিয়েছে, সেখানে জামায়াতের গোটা ব্যবস্থাপনা তাকে আঁকড়ে ধরতে এবং তার মান উন্নত করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই অবস্থা থেকে যখন কেউ উঠে আসতে পারেননি, তখন তাকে জামায়াত থেকে পৃথক করে দিতে কখনো দ্বিধা সংকোচ করা হয়নি, যাতে করে একজনের দুর্বলতা গোটা জামায়াতে বিস্তৃত হতে না পারে। এভাবে ছয় বছরের দীর্ঘ সময়কালে দশ কোটি মানুষের বিরাট জাতির মধ্য থেকে যেসব লোককে এই সংগঠনের জন্যে ছাঁটাই বাছাই করা সম্ভব হয়েছে, ভারত বিভাগের সময় তাদের সংখ্যা ছিল ছয় শত পঁচিশ জন। এই লোকগুলোকে ছাঁটাই বাছাই করার কাজে জামায়াতের সাহিত্য এবং জামায়াতের যাচাই বাছাইর মানদণ্ড যতোটা কাজ দিয়েছে, দেশের পরিস্থিতি তার চাইতে কিছুমাত্র কম কাজ দেয়নি। এটা ছিল সেই সময়, যখন আমাদের জাতি কঠিন হাংগামাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে নিমজ্জিত। সে সময় কোনো হাংগামী, খ্যাতি লাভের আকাংখী, মর্যাদা লোভী এবং আবেগ প্রবণ ব্যক্তির পক্ষে এমন একটি নীরব ও নীরস আন্দোলনে শরীক হবার চিন্তা করাই সম্ভব ছিল না। একারণে আমাদের আহবানে কেবল ঐ সমস্ত লোকই সাড়া দিয়েছে, সত্য দীনের জন্যে যাদের অন্তর

ছিল নিষ্ঠাপূর্ণ, ঐকান্তিক এবং যাদের মধ্যে ছিল ঠাণ্ডা মনে বুঝে শুনে স্বীয় জীবনের একটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা এবং তার জন্যে অবিরাম ও নীরবচ্ছিন্নভাবে গোটা জীবন কাজ করতে থাকার যোগ্যতা।

আমাদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

এভাবে সমাজ থেকে যেসব লোককে বাছাই করা হয়েছে, তাদের প্রশিক্ষণের জন্যে আমাদেরকে কোনো খানকা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়েনি। প্রথম দিন থেকেই আমরা প্রশিক্ষণের সেই স্বাভাবিক পন্থার উপর বিশ্বাস করে আসছি, যে পন্থায় নবুয়্যতের প্রাথমিক অধ্যায়ে মক্কার মুসলমানদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। সেই মুসলমানদের জন্যে তাদের নিজেদের ঘর, নিজেদের পাড়া ও জনপদের অলি গলি এবং হাট বাজারই ছিল প্রশিক্ষণাগার। তাঁদের উপর আপতিত পরীক্ষাসমূহই তাদেরকে তৈরী করার এবং পরিচ্ছন্ন করার জন্যে যথেষ্ট ছিল। সত্যের আহবানকে গ্রহণ করে তারা যখন একটি আদর্শকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, তখন প্রশিক্ষণ দানের জন্যে তাদেরকে কোনো জংগল কিংবা গহবরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। তাদের চরিত্র গঠনের জন্যে পৃথক কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রয়োজন পড়েনি। তারা যে সমাজে বাস করছে, সে সমাজ যখন তাদের মুখ থেকে সত্য আদর্শ অনুসরণের ঘোষণা শুনতো, তাদের জীবনে যখন সেই ঘোষণার প্রভাব অনুভব করত, তখনই তাদেরকে জ্বালা যন্ত্রণা, অত্যাচার নির্যাতন এবং দুঃখ কষ্ট দিয়ে দিয়ে মজবুত করার কাজে লেগে যেতো। এই প্রশিক্ষণাগার থেকেই তারা তৈরী হয়ে বের হয়েছিল এবং মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে আরবের মানচিত্র পাল্টে দিয়েছিল। আমরা এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতিরই অনুসরণ করেছি। যে ব্যক্তিই জামায়াতে ইসলামীতে প্রবেশ করেছেন, তার কাছ থেকেই এ শপথ নেয়া হয়েছে যে, এখন থেকে তিনি বিশ্ব নিখিলের প্রভূ মহান আল্লাহর হুকুমের অনুগত এবং মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর (স) হিদায়াতের অনুসারী হয়ে জীবন যাপন করবেন আর আল্লাহ ও রাসূলের (স) দীনকে বিশ্বব্যাপী বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে কাজ করবেন।

এরপর এই লোকগুলো যে যেখানে যে অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতিতে অবস্থান করছিলেন, সেখানেই তার জন্যে এক সর্বব্যাপী ও সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণাগার খুলে যায়। যদিও সে এমন এক সমাজে জীবন যাপন করছিল, যেখানে কেউ–ই খোদার খোদায়ীত্ব এবং মুহাম্মদের (স) রিসালতে অস্বীকারকারী ছিল না এবং এমন কথা বলবার জন্যেও কেউ প্রস্তুত ছিল না যে, পৃথিবীতে ইসলামের পরিবর্তে কুফরী বিজয়ী হোক। কিন্তু কোনো প্রকার অতিরঞ্জন ছাড়াই একথা বলা যেতে পারে যে, আমাদের মধ্যকার কোনো

একজন লোকও এই সমাজে এমন একটা অনুকূল জায়গা পাননি, যেখানে বাস্তব ও কার্যকরভাবে আল্লাহর আনুগত্য, রাসূলের (স) অনুসরণ এবং জাহেলী পন্থা পদ্ধতির উপর স্বেচ্ছায় ও আনন্দচিত্তে ইসলামী পন্থা পদ্ধতির অগ্রাধিকার মেনে নেয়া হয়েছে। আমাদের লোকগুলো সত্য আদর্শের পথ অবলম্বন করতেই তাদের প্রত্যেককে সর্বত্র একটি সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয়। এই সংঘাতের সূচনা হয় নিজের নফসের সাথে। অতপর তার পরিধি এমন সকল স্থানে বিস্তৃত হতে থাকে, যেখানেই এই বিকৃত সমাজের পথ ও পন্থার সাথে আমাদের এই নতুন পথ ও পন্থার ধাক্কা লাগে। কারো স্বভাব চরিত্রের কোনো কন্দরেও যদি কোনো ত্রুটি থেকেছে, তবে সে সেই কন্দরেই পরাস্ত হয়েছে এবং এই সংঘাত এরূপ লোকদেরকে তার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ছাঁটাই করে দূরে নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু যারা ঘোষণা করেছে, 'রাববুনাল্লাহ (আল্লাহ আমাদের রব)' অতপর এই ঘোষণার উপর অটল অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকেছে, তাদের জন্যে এই সংঘাত এক অতি উত্তম প্রশিক্ষক ও পরিচ্ছন্নকারী প্রমাণিত হয়েছে। এই সংঘাত তাদেরকে সবর, সহিষ্ণুতা এবং ত্যাগ ও কুরবাণীর প্রশিক্ষণ দিয়েছে। তাদের অন্তরে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের চিন্তা ও বাসনাকে পাকাপোক্ত করে দিয়েছে। উদ্দেশ্যের প্রতি প্রবল ভালবাসা জাগিয়ে তুলেছে এবং তার জন্যে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করার জযবা সৃষ্টি করে দিয়েছে। কামনা, বাসনা ও লোভ লালসাকে পরাস্ত করতে শিখিয়েছে। এই সংঘাত তাদেরকে এতোটা উপযুক্ত বানিয়ে দিয়েছে যে, যে জিনিসকে তারা সত্য বলে অনুভব করেছে তা করার জন্যে কোনো প্রকার লোভ বা বাইরের চাপ ছাড়াই স্বীয় ঈমানের তাগিদে সে জন্যে সময় ও শ্রম ব্যয় করেছে। নিজের উদ্দেশ্য পথে যতো ক্ষতিই স্বীকার করতে হোক না কেন, যতো বিপদই পোহাতে হোক না কেন, যতো সমস্যারই মোকাবেলা করতে হোক না কেন, এবং যত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীনই হোক না কেন এই সংঘাত তাদের মধ্যে তা মেনে নেবার শক্তি সৃষ্টি করে দিয়েছে।

প্রশিক্ষণের এই স্বাভাবিক কোর্সের সহযোগিতার জন্যে আরো তিনটি জিনিস ছিল, যা সেই প্রশিক্ষণের ঘাটতিকে পূরণ করে দিয়েছে। সেগুলো হলোঃ

এক. দাওয়াত ও তাবলীগ
দুই. সাংগঠনিক শৃংখলা
তিন. সমালোচনার স্পীরিট

দাওয়াত ও তাবলীগ

দাওয়াত ও তাবলীগের একটি উপকারিতা হলো এই যে, এতে অপর মানুষের সংশোধনের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নিজের পরকালীন কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু একাজের উপকারিতা কেবল এই একটিই নয়। বরঞ্চ সেই সাথে এর

আরেকটি ফায়দা হলো এই যে, এতে দীনের প্রচারক ও আহবানকারীরও আত্মসংশোধন হয়ে যায়। কোনো ব্যক্তি কোনো জিনিসকে সত্য বলে স্বীকার করার পরও যদি স্বস্থানে বসে থাকে এবং কেবলমাত্র নিজের জীবনকেই সে অনুযায়ী গড়ার কাজে সন্তুষ্ট থাকে, তবে তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মতো যার কাছে কিছু পুঁজি আছে এবং সে ঘরে বসে বসে সেই পুঁজি দিয়ে জীবন নির্বাহ করছে। এই ব্যক্তির পরিণতি কেবল এটাই হবেনা যে, তার পুঁজি বাড়বেনা। বরঞ্চ কাজে না খাঁটানোর ফলে উল্টো তার মূল পুঁজিটাই দিন দিন কমে যাবে। এমনকি এমন একটি সময় আসবে, যখন তার পুঁজি শূন্যের কোঠায় গিয়ে পৌছুবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি সত্য লাভ করতে পেরেছে এবং তা প্রচার ও প্রসারের জন্যে আত্মনিয়োগ করেছে তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যবসায়ীর মতো, যে তার পুঁজিকে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেছে, এর ফলে বহু লোকের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ ঘটেছে এবং তার নিজের পুঁজিও দিন দিন প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে গিয়েছে।

সত্য আদর্শ প্রচারের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, যে ব্যক্তি একাজে আত্মনিয়োগ করে, তার নিজের জীবনেই এই আদর্শ সব চাইতে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। এর চর্চা, এর প্রচার ও প্রসারের পথ খুঁজে বের করা, এর সমর্থনে যুক্তি প্রমাণ যোগাড় করা এবং এর পথের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করার চিন্তায় সে যতো বেশী আত্মনিয়োগ করবে, ততো বেশীই সে স্বীয় আদর্শের গহীনে নিমজ্জিত হবে। নিজ আদর্শের জন্যে যখন সে বিভিন্ন রকম বিপদ মুসীবত ও দুঃখ কষ্টের মোকাবিলা করবে, গালি শুনবে, বিদ্রুপ ও ভর্ৎসনা দ্বারা তিরস্কৃত হবে, অপবাদ ও অভিযোগ বরদাশত করবে এবং অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করবে, তখন এই সকল দুঃখ কষ্ট তার সেই সত্য আদর্শের প্রতি তার আন্তরিক প্রেম ও ভালবাসাকে বৃদ্ধি করতে থাকবে।

দীন প্রচারের এই কাজ তাকে খাঁটি মানুষ বানানোর ব্যাপারে আরেক ধরনের সাহায্য করে। সে যখন লোকদের বলে, নিজের গোটা জীবনে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য গ্রহণ করো কথা ও কাজের পার্থক্য ও মুনাফেকী দূর করো এবং নিজের মধ্য থেকে জাহেলিয়াতের সকল প্রভাব দূরে নিক্ষেপ করো তখন তার চারপাশ থেকে সমাজের শত শত চোখ দূরবীণ দৃষ্টি দিয়ে তার নিজের জীবনের পর্যালোচনা শুরু করে দেয়। ফলে তার জীবনের একটি ত্রুটিও এমন থাকেনা যার প্রতি মানুষের বাক্যবাণ ইংগিত করেনা। এভাবে একটি লোককে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করার কাজে আল্লাহর বহু বান্দা জেনে বা না জেনে আত্মনিয়োগ করে। যিনি নিসংকোচে অভিযোগকারীদের এই সেবাকে নিজের

সংশোধনীর কাজে লাগান, এক সুন্দর স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তার জীবন পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। পক্ষান্তরে যিনি এই গণসমালোচনার মুখে পরাস্ত হয়ে পিছে হটে যান, তিনি নিজেই একথা প্রমাণ করে দেন, তিনি সত্য প্রচারের উপযুক্ত ব্যক্তি নন।

সাংগঠনিক শৃংখলা

যারা জামায়াতে ইসলামীতে প্রবেশ করতে চান, প্রথম দিন থেকেই আমরা তাদের একটি কথা জানিয়ে দিয়েছি। তা হলো, আপনি প্রথমেই ভালভাবে যাচাই পরখ করে নিশ্চিত হোন যে, সত্যিই জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর দীন কায়েম করার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা এবং এর দাওয়াত, কর্মসূচী ও সাংগঠনিক আদর্শ সে রকম কিনা যা কুরআন সুন্নাহ্ অনুযায়ী দীন প্রতিষ্ঠাকামী একটি দলের হওয়া উচিত? অতপর এব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত হবার পর যখন কেউ জামায়াতে প্রবেশ করবে, তখন তাকে মা'রূফের ক্ষেত্রে এই সংগঠনের আনুগত্য ও নিয়ম শৃংখলা পালনের ক্ষেত্রে ঠিক সেরকম অধ্যবসায়ী হতে হবে, যার হুকুম দেয়া হয়েছে কুরআন ও হাদীসে। এরপর জামায়াতের ডিসিপ্লিন ভংগ করার অর্থ কেবল এই হবেনা যে, সে একটি দলের ডিসিপ্লিনের বিরুদ্ধাচরণ করছে, বরঞ্চ তার অর্থ হবে এই যে, সে নিজে নিজের আকীদা বিশ্বাস অনুযায়ী যে কাজকে আল্লাহর কাজ মনে করেছিল, জেনে বুঝে সে সেটার ক্ষতি সাধন করেছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্ ও রাসূলের (স) বিরুদ্ধাচরণ করছে।

এধরনের নিয়ম শৃংখলার মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীর পয়লা ফায়দা যেটা হয়েছে, তা হলো, জামায়াতে এধরনের লোক কদাচিৎই প্রবেশ করতে পেরেছে, যারা জামায়াতকে সত্যের বাহক হবার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেনি এবং আবেগ উন্মাদনা, কল্পনা বিলাস ও সাময়িক আকর্ষণের কারণে জামায়াতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

এর ফলে জামায়াত দ্বিতীয় যে ফায়দাটি লাভ করেছে, তা হলো, যারাই জামায়াতে প্রবেশ করেছেন, আনুগত্য ও নিয়ম শৃংখলা পালন করার জন্যে তারা কোনো চাপ ও শাসনের মুখাপেক্ষী হননি। তারা বেশীরভাগই নিজেদের ঈমানের তাগিদে ডিসিপ্লিন মেনে নিয়েছেন। তাদেরকে নিয়ম শৃংখলা ও বিধি বিধান অনুযায়ী কাজ করতে অভ্যস্ত করার ক্ষেত্রে তেমন কোনো কাঠখড়ি পোড়াতে হয়নি।

এখন যদি আমাদের ডিসিপ্লিন একটি ইসলামী জামায়াতের কাংখিত মানের চাইতে নীচে থেকে থাকে, তবে তার কারণ হলো, আমাদের ঈমান সেই মানের নয়, যেমনটি ছিল সাহাবায়ে কিরামের (রা)। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের সমস্ত

ত্রুটি স্বীকার করা সত্ত্বেও আমরা অতিরঞ্জন ছাড়াই একথা বলতে পারি যে, জামায়াতে ইসলামী তার সাংগঠনিক নিয়ম শৃংখলা এবং কর্মীদের সুশৃংখলার দিক থেকে এদেশের অন্য সকল দলের তুলনায় উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এসত্য এখন আমাদের বিরোধী মহলও স্বীকার করতে বাধ্য।

সমালোচনার স্পীরিট

জামায়াতের ভিতরগত ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও পূর্ণতার জন্যে তৃতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটির সাহায্য আমরা নিয়েছি, তা ছিল এই যে, প্রথম দিন থেকেই আমরা সংগঠনের অভ্যন্তরে গঠনমূলক সমালোচনার স্পীরিট সজীব রাখার চেষ্টা করেছি। সমালোচনাই হচ্ছে সেই জিনিস যা প্রতিটি ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি যথাসময়ে অংগুলি নির্দেশ করে এবং তা সংশোধনের অনুভূতি সৃষ্টি করে। সামষ্টিক জীবনে নৈতিক দিক থেকে সমালোচনার গুরুত্ব ঠিক সেরকম, প্রাকৃতিক পরিবেশগত দিক থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব যেরকম। যেমন করে মালিন্য ও পবিত্রতার অনুভূতি বিলীন হয়ে যাওয়া এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যাবার ফলে একটি জনপদের পরিবেশ নোংরা হয়ে যায় এবং সেই পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার রোগের প্রার্দুভাব ঘটে, ঠিক তেমনি, সমালোচনার দৃষ্টিতে ত্রুটি বিচ্যুতি দেখিয়ে দেবার মতো চোখ, বলে দেবার মুখ এবং শুনবার মতো কান যদি বন্ধ হয়ে যায়, তবে যে জাতি, সমাজ ও দলের মধ্যে এই অবস্থা সৃষ্টি হবে, তা অন্যায় ও খারাবীর কেন্দ্রে পরিণত হতে বাধ্য। অতপর কোনো প্রকারেই আর তা সংশোধন হতে পারেনা। এসত্যের ব্যাপারে আমরা কখনো অসতর্ক হইনি। আমরা যেভাবে সকল মানুষের, নিজ দেশের এবং মুসলিম মিল্লাতের ত্রুটিসমূহের স্বাধীনভাবে সমালোচনা করেছি, ঠিক তেমনি জামায়াতের অভ্যন্তরেও সমালোচনার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখেছি, যাতে করে জামায়াতের অভ্যন্তরে যেখানেই কোনো ত্রুটি বর্তমান থাকে যথাসময়ে তা চিহ্নিত হয় এবং তা দূর করার চেষ্টা চালানো যায়। জামায়াতের প্রতিটি ব্যক্তির কেবল সমালোচনার অধিকারই নেই, বরঞ্চ এটা তার জন্যে অবশ্য কর্তব্য যে, তিনি যদি কোনো ত্রুটি অনুভব করেন, তবে সে সম্পর্কে চুপ থাকবেন না। জামায়াতের প্রতিটি সদস্যের দলীয় কর্তব্যসমূহের মধ্যে এটিও একটি যে, তিনি তার সাথী সদস্যদের ব্যক্তি জীবনে কিংবা সামষ্টিক আচরণে বা জামায়াতের সাংগঠনিক শৃংখলায় অথবা জামায়াতের দায়িত্বশীলদের মধ্যে যদি কোনো ত্রুটি লক্ষ্য করেন, তবে নির্দিধায় তা সংশ্লিষ্ট স্থান বা ব্যক্তিকে বলবেন এবং সংশোধনের আহবান জানাবেন। একইভাবে যাদের সমালোচনা করা হবে, তাদেরকে কেবল সমালোচনা বরদাশত করতে অভ্যস্তই বানানো হয়নি, বরঞ্চ

এব্যাপারেও অভ্যস্ত করা হয়েছে যে, ঠাণ্ডা মাথায় ও স্থির চিত্তে সমালোচনা সম্পর্কে চিন্তা করে দেখবে এবং যে ত্রুটির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে তা যদি সত্যিই তার মধ্যে বর্তমান থাকে,তবে তা দূর করার কাজে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। আর যদি তা তার মধ্যে বর্তমান না থাকে তবে সমালোচনাকারীর ভুল নিরসণ করে দিবে। এক্ষেত্রে অনেক সময় সমালোচনার বৈধ সীমা এবং যুক্তিসংগত পন্থা জানা না থাকার কারণে অনেক ভুলও হয়েছে। তাতে আমাদেরকে কিছু না কিছু ক্ষতিগ্রস্তও হতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমালোচনার এ প্রাণ স্পন্দনকে আমরা ঝিমিয়ে পড়তে দিইনি। এরই ফলে জামায়াতের প্রতিটি সদস্য গোটা জামায়াতের প্রশিক্ষণ ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হয়েছে এবং নিজের প্রশিক্ষণ ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে জামায়াত থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বিস্তৃতি ও বাস্তব পদক্ষেপ

ইসলামী আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে ধাঁচে জামায়াতের সাংগঠনিক ও প্রশিক্ষণের কাজ আঞ্জাম দেয়া হয়েছে, পিছের পাতাগুলোতে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে এসেছি। আমরা চেয়েছিলাম, সে অধ্যায়টা যদি আরো কিছু দীর্ঘ হতো, তা হলে আমরা আমাদের সংগঠনের মজবুতি অর্জন এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ কাজ সম্পূর্ণ করার সুযোগ পেতাম। কিন্তু জামায়াত প্রতিষ্ঠার ঠিক ছয় বছর পর ১৯৪৭ সালে সেই কিয়ামত সদৃশ বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যায়, যা সংঘটিত হবার নিদর্শনাবলী দেখে আগেই আমাদেরকে প্রথম অধ্যায়ের পূর্ণতার অপেক্ষা না করে ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় অধ্যায়ে পা ফেলতে হয়েছিল। এই ছোট কিয়ামত আমাদের কাজ এবং কার্যব্যবস্থার উপর দুধরনের অনিবার্য প্রভাব ফেলেঃ

১৯৪৭ সালের বিপ্লবের প্রভাবঃ পয়লা প্রভাব জামায়াতের বিভক্তি

এর পয়লা প্রভাব এই ছিল যে, দেশের রাজনৈতিক বিভক্তি জামায়াতে ইসলামীকেও দুইভাগে বিভক্ত করে দেয়। পাকিস্তান এবং ভারত উভয় দেশের পরিস্থিতি এবং সার্বিক অবস্থা আকস্মিকভাবে এতোটা বিপরীতধর্মী হয়ে যায় যে, উভয় দেশে একই সংগঠন, একই পলিসি এবং একটি নেতৃত্বের অধীন কাজ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। দেশ বিভাগের আগেই এই অনিবার্য পরিস্থিতি কিছুনা কিছু আমরা আঁচ করেছি। ফলে, ১৯৪৭ এর মাদ্রাজের ভাষণে বিষয়টির প্রতি ইংগিত করেছিলাম। সে সম্মেলনে বলেছিলাম, দেশ বিভাগের পর উভয় দেশে একই সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা অক্ষুণ্ন রাখা যাবেনা। সুতরাং বাস্তবে যখন দেশ বিভাগ হয়ে গেল, তখন কোথাও কোথাও আমাদের আশংকার চাইতেও অধিক কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অতপর যোগাযোগ

ব্যবস্থা বহাল হবার প্রথম সুযোগেই মুসলিম লীগের মতো আমাদেরকেও এ সিদ্ধান্ত নিতে হলো যে, উভয় দেশের জামায়াত এখন থেকে পৃথক পৃথকভাবে কাজ করবে। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতপর আকীদা ও উদ্দেশ্য লক্ষ্য ব্যতীত জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান অন্য সকল বিষয়ে জামায়াতে ইসলামী হিন্দের থেকে পৃথক হয়ে যায়।[১৬]

দ্বিতীয় প্রভাবঃ বিস্তৃতি ও বাস্তব পদক্ষেপ

এ রাজনৈতিক বিপ্লবের দ্বিতীয় প্রভাব এই পড়েছিল যে, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানকে একটি অন্তবর্তীকালীন ব্যাপক ও বাস্তব অধ্যায়ে প্রবেশ করতে হয়। অথচ সংগঠন ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ণতার জন্যে এখনো অনেক কিছু করার বাকী ছিল। যেসব কারণে এই সম্মুখ পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তা সেই সময়কার সম্মেলনগুলোতে বলে দেয়া হয়েছিল, যেগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৮ এর মার্চ ও এপ্রিল মাসে। সংক্ষেপে কারণগুলো নিম্নরূপ ছিলঃ

১৯৪৭ সালের বিপ্লব এবং ভারতবর্ষের মুসলমানদের অবস্থা

আমাদের দৃষ্টিতে ১৯৪৭ সালের রাজনৈতিক বিপ্লব ছিল নেহাতই একটি কৃত্রিম বিপ্লব। অর্থাৎ এই বিপ্লব কোনো মানসিক, নৈতিক এবং সামাজিক বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে সংঘটিত হয়নি। বরঞ্চ অধিকতর বাইরের পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং ভয় ও চাপের ফলশ্রুতিতে এ বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। এই বিপ্লবের পেছনে যদি কোনো গঠনমূলক শক্তি চিহ্নিত করা যেতে পারতো তবে এতোটুকুই করা যেতো যে, একদিকে ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অফিস আদালতসমূহের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ থেকে মুসলমানদের মধ্য থেকে একটি ভালো সংখ্যার এমনসব লোক তৈরী হয়েছিল, যারা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব ভালোভাবে হোক, মন্দভাবে হোক পালন করতে পারতো। অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগ্রহ পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছিল, যা সাধারণ ও অসাধারণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে আন্দোলিত করে তুলেছিল। কিন্তু একথা পরিষ্কার, এ দুটি জিনিস একটি সত্যিকার, মজবুত ও ফলপ্রসূ রাজনৈতিক বিপ্লব সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ঠ ছিল না। সেই সাথে মুসলমানদের সামনে সেই জীবন ব্যবস্থার একটি সুস্পষ্ট রূপরেখাও

---

১৬. এখানে একথা জেনে রাখা দরকার যে, বিভক্তিকালে পাকিস্তানে যারা স্থায়ী রুকন ছিলেন এবং যারা ভারত থেকে হিজরত করে এসেছেন তাদের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮৫ জন। আর যেসব রুকন ভারতে থেকে যান তাদের সংখ্যা ছিল ২৪০ জন।

বর্তমান থাকা জরুরী ছিল, স্বাধীন দেশ লাভ করার পর যার উপর তাদেরকে নিজেদের জাতীয় জীবনের অট্টালিকা নির্মাণ করতে হতো। আর সেই চিত্র ও রূপরেখা সম্পর্কে তাদের সমষ্টিগত মানসিকতারও ঐক্য ছিল একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া তারা যেন কোনো প্রকার বিক্ষিপ্ত চিন্তা, অসংলগ্ন ধ্যান ধারণা এবং উদ্দেশ্যগত বিরোধের মধ্যে নিমজ্জিত না থাকে। মুসলমানদেরকে নৈতিক দিক থেকেও এতোটা সৎ ও পূর্ণতার অধিকারী হওয়ার দরকার ছিল, যাতে করে স্বাধীনতা লাভের পর উত্তমভাবে নিজেদের রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সক্ষম হতো। মুসলমানদের মধ্যে সবর, আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, আইন কানুন ও নিয়ম শৃংখলার অনুসরণ, পরিশ্রম করা, পারস্পরিক সহযোগিতা করা, সৌভ্রাতৃত্ব, আমানতদারী, কর্তব্য পরায়ণতা, দায়িত্বানুভূতি, সীমা লংঘন না করার চেতনা এবং ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের গুণাবলীও বর্তমান থাকা জরুরী ছিল, যেগুলো একটি সফল সামাজিক জীবনের জন্যে অপরিহার্য।

এসব জিনিসের কমতি আমরা তখনি অনুভব করছিলাম, যখন প্রথম প্রথম মুসলমানরা নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্রের ইচ্ছা বাসনা প্রকাশ করছিল। মুসলমানদের নেতৃত্বের বাগডোর যাদের হাতে ছিল, এ বিষয়গুলোর প্রতি আমরা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিন্তু তারা এর প্রতি কোনো গুরুত্বই দিলনা। আমরা নিজেরা এসব কমতি পূরণ করার চেষ্টা করি। কিন্তু এর ফলে উল্টো আমাদেরকে শত্রু মনে করা হয় এবং আমাদের সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করা হয়। বিষয়টি এ পর্যন্তই সীমীত ছিলনা। বরঞ্চ দশ বছর যাবত মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলন যে ঢংএ চালানো হয়, তাতে মুসলমানদের মন মানসিকতা আগের চাইতেও অধিক বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তাদের নৈতিক চরিত্র আগের চাইতে খারাপ হয়ে যায়। তাদের সামাজিক গুণাবলী পূর্বের চাইতে অধিক অধপতিত হয়ে পড়ে। বিভিন্নমুখী ধ্যান ধারণা, আকীদা বিশ্বাস, দৃষ্টিভংগি ও উদ্দেশ্য লক্ষ্যের অধিকারী লোকদের একত্র করা হয়, যারা ইসলামের শ্লোগান দেবার সাথে সাথে এমনসব বৈচিত্রপূর্ণ কথাবার্তা বলতে থাকে, যার ফলে ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানদের প্রচলিত ধারণাটুকুও কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং বাস্তবে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল তখনো তারা জানতোনা যে, সেই ইসলামের বাস্তব রূপ কি, যার ভিত্তিতে এই নতুন রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে? এই কুয়াশাচ্ছন্ন ধ্যান ধারণার প্রতি আমরা বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কিন্তু প্রতিউত্তরে গর্বের সাথে বলা হয়েছে যে, আমরা জাতির বিভিন্ন মতাবলম্বী সমস্ত লোকদের ঐক্যবদ্ধ করেছি। অথচ এই ধরনের জনসমাবেশ একটি নেতিবাচক যুদ্ধের জন্যে তো হতে পারে বটে, কিন্তু একটি ইতিবাচক পরিগঠণের অধ্যায়

আসতেই তাদের বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়াটা একেবারেই অবশ্যম্ভাবী। নৈতিক এবং সামাজিক অবস্থাও ছিল ঠিক অনুরূপ। জাতীয় আন্দোলন যে ঢংএ পরিচালনা করা হচ্ছিল, তা মুসলমানদের নৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা তো দূরের কথা, বরঞ্চ যতোটুকু ছিল তার চাইতেও নীচের দিকে ঠেলে দিয়েছে। নিকৃষ্টতম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী লোকেরা রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সাংবাদিকতার জগত কব্জা করে নেয়। প্রতিটি ময়দানে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। প্রতিটি অন্যায়ের জবাব অন্যায় দ্বারা দেয়া হয় এবং এটাকে সওয়াবের কাজ মনে করা হয়। এমনকি (হিন্দু মুসলিম উভয় জাতি) একে অপরের বিরুদ্ধে জিদ ও শত্রুতার ক্ষেত্রে নিকৃষ্টতম আচরণ প্রদর্শন করে।

এই গোটা অবস্থা আমাদের সামনে দিয়ে ঘটে যাচ্ছিল আর এর পরিণতি সম্পর্কেও আমরা ভালভাবে অবগত ছিলাম। একারণে যেদিন দেশ বিভাগের ঘোষণা উচ্চারিত হয়, সেদিনই আমরা বুঝলাম, পুনর্গঠনের কাজ এযাবত যতোটুকই আমরা করতে পেরেছি, আপাতত সেটাকেই যথেষ্ঠ মনে করতে হবে এবং কোনো সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, নৈতিক শক্তি ও সামাজিক সংশোধন ছাড়াই যে জাতিটি স্বাধিকার লাভ করেছে, এমুহূর্ত থেকেই তাকে রক্ষা করার কাজে হাত দিতে হবে। দেশ বিভক্তির প্রাক্কালে এবং বিভক্তির পর পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তা দেখে এই আকস্মিক পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা আরো সাংঘাতিকভাবে অনুভূত হয়। ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে যে অবস্থায় মুসলমানরা বহিষ্কৃত হয়, পাকিস্তান থেকে অমুসলমানরা যেভাবে নিগৃহীত হয়, অমুসলিমদের পরিত্যক্ত অর্থ সম্পদ নিয়ে যে কাণ্ড ঘটানো হয় এবং মুসলিম মুহাজিররা যে করুণ অবস্থার সম্মুখীন হয়, এসব কিছুই ছিল এমন একটি আয়না, যার ভিতর দিয়ে গোটা জাতি, জাতির বিশেষ ও নির্বিশেষ মানুষগুলো, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ, শাসক ও কর্মচারী এবং দীনদার ও দুনিয়াদারসহ সব ধরনের লোকদের নৈতিক ও সামাজিক চিত্র সম্পূর্ণ উলংগ হয়ে পড়ে। অতপর ক্ষমতা হাতে আসতেই আমাদের জাতির নেতারা, যারা এসময় কেবল জাতির নেতাই ছিলনা বরং শাসকও ছিল, দেশের ভবিষ্যত রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে যে ধরনের বিভ্রান্তিকর পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা বলতে শুরু করে দেয় এবং জাতি যেভাবে প্রথম ক'মাস সেগুলো নীরবে শুনতে থাকে, তা দেখে স্পষ্ট বুঝা গিয়েছিল যে, এখন এই অনুভূতিহীন জাতির বাগডোর একদল চিন্তাহীন লোকের মুষ্ঠিবদ্ধে এসে গেছে। এটা নীরবে বসে বসে গঠনমূলক কাজ করার সময় নয়। এখন একটি মুহূর্তও যদি নষ্ট করা হয়, তবে এইসব লোক, যারা নিজেদের লক্ষ্য স্থির করা ছাড়াই না বুঝে না শুনে পথ চলা শুরু করেছে, অচিরেই তারা কোনো ভ্রান্ত মতবাদকে দেশের আদর্শিক

ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বসতে পারে। এরূপ ঘোষণা যদি দিয়েই দেয়া হয়, তবে বর্তমান অবস্থার তুলনায় হাজার গুণ অধিক কুরবানী ছাড়া তা আর পাল্টানো সম্ভব হবেনা।

জামায়াতের পরীক্ষা

সৌভাগ্যবশত এসময় এমন কিছু পরীক্ষা আসতে থাকে, যেগুলো তৃতীয় অধ্যায়ে পা ফেলার আগেই আমাদেরকে একথা অনুমান করার সুযোগ করে দেয় যে, আমাদের জামায়াত এসময় বাস্তবে তার নৈতিক প্রশিক্ষণ ও সাংগঠনিক শৃংখলার দিক থেকে কতোটা শক্তির অধিকারী ছিল এবং সামনের অধ্যায়গুলোতে এ শক্তির উপর কতোটা নির্ভর করা যেতে পারে?

পয়লা পরীক্ষা

এসব পরীক্ষার মধ্যে পয়লা পরীক্ষার সম্মুখীন হয় ঐ সব লোক, যারা পূর্ব পাঞ্জাবের দাংগা হাংগামার কিয়ামতের ভেতর দিয়ে পাকিস্তান পৌঁছেছিলেন। আমরা একজন একজন করে তাদের প্রত্যেকের অবস্থার খোঁজ খবর নিয়েছি এবং একথা জেনে সন্তুষ্ট হয়েছি যে, কেবল জামায়াতের রুকনরাই নয়, বরঞ্চ সহযোগী ও সমর্থকরাও হিম্মত, সাহস, সবর ও দৃঢ়তার সাথে নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করে এসেছেন। তাদের একজনও মুসলিম লীগ লিডারদের মতো আগে ভাগে পালিয়ে আসনেনি। কেউ কাপুরুষতা প্রদর্শন করেননি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ এলাকায় বিপদ মুসিবতে আপন দীনি ভাইদের পাশে ছিলেন। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি সামর্থ অনুযায়ী সর্বাত্মকভাবে মুসলমানদের রক্ষা করার, আশ্রয় দেবার এবং সুশৃংখলভাবে বের করে আনার চেষ্টা করেছেন। অনেকেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন। এঁদের অধিকাংশই নিজ নিজ এলাকা থেকে বের হয়ে আসবার জন্যে কেবল তখনই রওয়ানা করেছেন, যখন সে এলাকায় আর কোনো মুসলমান বের হয়ে আসার বাকী ছিলনা।

দ্বিতীয় পরীক্ষা

দ্বিতীয় পরীক্ষা আসে পশ্চিম পাকিস্তানে, যখন সেখানকার অমুসলিমরা বের হয়ে যাচ্ছিল। এক্ষেত্রেও আমরা সূক্ষ্মভাবে খতিয়ে খতিয়ে জামায়াতের অনুসৃত নীতি ও আচরণের পর্যালোচনা করেছি। এপর্যায়েও আমরা এটা জেনে খুশী হয়েছি যে, কেবল জামায়াতের রুকনরাই নয়, বরং সমর্থক সহযোগীদের মধ্যেও কোনো ব্যক্তি খুন খারবী ও লুটতরাজে অংশ নেয়নি। কোনো স্থানে তো গোটা জনবসতির মধ্যে কেবল দু'চার জন লোক এমন পাওয়া গেছে, যারা

লুটতরাজ থেকে দূরে ছিলেন আর দেখা গেছে সে দু'চার জনও ছিলেন জামায়াতেরই সমর্থক। কোনো কোনো স্থানে জামায়াতের লোকেরা জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়ে অমুসলিমদের আশ্রয় দিতে দ্বিধাবোধ করেনি। তাছাড়া আল্লাহর অনুগ্রহে, জামায়াতের সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কিত, এমন একজন লোক সম্পর্কেও এরূপ সংবাদ আমরা পাইনি যে, তার দ্বারা অমুসলিম নারীদের কোনো প্রকার মান সম্মান ক্ষুণ্ন হয়েছে। অথচ এটা ছিল সেই পরিবেশ, যখন এই ধরনের অপকর্মের ব্যাপক সুযোগ ছিল।

তৃতীয় পরীক্ষা

তৃতীয় পরীক্ষা আসে তখন, যখন জামায়াত কর্মীদেরকে শরণার্থী শিবিরে কাজ করবার আহবান জানানো হয়। এই শেষ পরীক্ষা আমাদেরকে পুরোপুরি আস্থাশীল করে দেয় যে, আমাদের যাবতীয় দুর্বলতা ও ত্রুটি সত্ত্বেও জামায়াতে ইসলামীর কাছে এমন একদল কর্মঠ কর্মী বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে, যাদের নৈতিক চরিত্র এবং সাংগঠনিক শৃংখলার উপর নির্ভর করা যেতে পারে। লাহোর, করাচী, পেশোয়ার, শিয়ালকোট, সারগোধা, লায়ালপুর এবং মুলতানে সর্বসমেত জামায়াতের প্রায় সাত শত কর্মী ও সহযোগী শরণার্থীদের সেবা কাজ করে। এই কর্মীদের অনেকেই ছিলেন তারা, যারা নিজেরাই শরণার্থী হিসেবে এসেছিলেন এবং এখনো কোনো স্থানে আশ্রয় নেবার সুযোগ পাননি। তা সত্ত্বেও তারা সেবা কাজের আহবানে 'লাব্বায়েক' বলতে দ্বিধা করেনি। তারা আত্মত্যাগ, কষ্ট সহিষ্ণুতা, সততা, বিশ্বস্ততা, পবিত্রতা এবং আনুগত্য ও নিয়ম শৃংখলার সার্বিক পরীক্ষা প্রদান করে। ফলশ্রুতিতে কমপক্ষে যে জিনিসটি প্রমাণিত হয়েছে, তা হলো, এইসব গুণাবলীর ক্ষেত্রে না সরকারী কর্মচারীরা তাদের সমকক্ষ আর না জাতির অন্যান্য দলের কর্মী। এই সাত শ' কর্মীর মধ্যে এমন একজনও পাওয়া যায়নি, যে নৈতিক দিক থেকে অনির্ভরযোগ্য প্রমাণ হয়েছে। তাছাড়া সাংগঠনিক শৃংখলার দিক থেকেও দুতিনটি হালকা অভিযোগের অধিক আর কিছুই আমাদের অবগতিতে আসেনি।

এগুলো ছিল সেই পুঁজি, যা সাথে নিয়ে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে প্রবেশ করেছি।

পয়লা পদক্ষেপঃ ইসলামী রাষ্ট্রের পরিষ্কার ধারণা দান

এ অধ্যায়ে আমাদের পয়লা পদক্ষেপ ছিল এই যে, আমরা সরাসরি জনগণের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদের সামনে পরিষ্কার ও নির্ধারিত পন্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের

ধারণা ও রূপরেখা পেশ করবো, এতোদিন জনগণ যার কেবল শ্লোগানই শুনে এসেছে এবং জাতির নেতারা এযাবত যে সম্পর্কে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কোনো খেদমতই আঞ্জাম দেয়নি।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী থেকে একাজ আরম্ভ করা হয় এবং কোনো প্রকার অতিরঞ্জন ছাড়াই বলা যেতে পারে যে, ইতিপূর্বের ইতিহাসে এই প্রথম শহর ও পাড়াগাঁর জনগণকে ব্যাপকভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি পূর্ণাংগ ও সুস্পষ্ট ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। একাজের জন্যে কেবল বই পুস্তক প্রচার এবং বৈঠকী সাক্ষাৎকারের উপর নির্ভর করা হয়নি। যেমনটি ছিল জামায়াতের ইতিপূর্বেকার কর্মপন্থা। বরঞ্চ জামায়াতের যে সদস্যই (রুকন) দায়িত্বপূর্ণ পন্থায় বক্তব্য রাখতে পারতো, তাকেই বক্তৃতা করার অধিকার দিয়ে দেয়া হয়। পাকিস্তানের অলিতে গলিতে সভা সমাবেশ করে জনগণকে একথা বলে দেয়া হয় যে, স্বাধীন হবার পর এখন মুসলমান হিসেবে তাদের প্রকৃত দায়িত্ব কি? তাদের বলা হয়, যে ইসলামের আপনারা কেবল বিশ্বাসীই নন বরং প্রেমিকও বটে, সে ইসলাম আপনাদেরকে কি ধরনের জীবন ব্যবস্থা প্রদান করে এবং সেই ইসলামী রাষ্ট্র বাস্তবিকপক্ষে কি ধরনের রাষ্ট্র, যা প্রতিষ্ঠার জন্যে আপনারা এতো বড় ত্যাগ স্বীকার করেছেন? সেই সাথে দেশের কর্তা, আমলা ও বুদ্ধিজীবি শ্রেণীকেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের কাছে কেবল তাত্বিকভাবেই ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা পেশ করা হয়নি, বরঞ্চ তা বাস্তবে প্রতিষ্ঠার কর্মপ্রণালীও পেশ করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অজুহাত হিসেবে যেসব যুক্তি পেশ করা হতে পারতো, সেগুলোকেও খণ্ডন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে নিম্নোক্ত পুস্তক পুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়েছেঃ

১. ইসলামের জীবন পদ্ধতি
২. ইসলামী আইন
৩. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার
৪. আযাদী কে ইসলামী তাকাযে
৫. মোতালেবায়ে নেযামে ইসলামী

দ্বিতীয় পদক্ষেপঃ ইসলামী রাষ্ট্রের চার দফা ফর্মূলা

পয়লা পদক্ষেপের সাথেই দ্বিতীয় পদক্ষেপও শুরু করা হয়। সেটা হলো, ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিমালা সম্বলিত চার দফার একটি পূর্ণাংগ অথচ

সংক্ষিপ্ত ফর্মূলা পেশ করা হয়।[১৭] এর সপক্ষে জনমতকে এতোটা প্রভাবিত ও সংগঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে এটি একটি জাতীয় দাবীতে পরিণত হয় এবং দেশের আইন সভা তা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এই পদক্ষেপ একারণে তখন তখনই দরকার ছিল, যেহেতু রাষ্ট্রের কর্তারা পরিষ্কারভাবে একটি ধর্মহীন (সেক্যুলার) রাষ্ট্রের মতাদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল এবং কেবলমাত্র একটি লজ্জা শরম তাদেরকে এর ঘোষণা থেকে বিরত রেখেছিল। আমরা অনুভব করলাম, এসময় যদি আমরা বিন্দুমাত্র অসতর্কতা অবলম্বন করি, তবে সেই সুযোগে শাসনতান্ত্রিকভাবে একটি অনৈসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করে দেয়া হবে। অতপর সেটাকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিবর্তন করা এতোটাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে যে, আজ যা সামান্য ত্যাগ কুরবাণী দ্বারা সাধিত হতে পারে, তা হাজারো সহস্র মানুষের ফাঁসিতে ঝুলার পরও সাধিত হওয়া হবে কষ্টকর।

জামায়াত নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারী

সংগ্রামের সূচনা করা হয় ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে আমাদের দাবীগুলো মুসলিম জাতির সর্বসম্মত দাবীতে পরিণত হয়। ক্ষমতাসীনরা এই দাবীকে অস্বীকারও করতে পারছিলনা, আবার এই তিক্ত বড়ি গিলতেও পারছিলনা। কিছু দিন তারা এই সর্বব্যাপী অগ্নিশিখার প্রতি বজ্রাহত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রাখছিল। অতপর তারা এমন একটি চালবাজি করলো, যেমনটি সবসময় কাপুরুষও নিকৃষ্ট চরিত্রের লোকেরা করে থাকে।

ষড়যন্ত্রটা ছিল এই যে, তারা এই লেখকের উপর একটি সুপরিকল্পিত বানোয়াট অপবাদ চাপিয়ে দিলো যেঃ "সে কাশ্মীর মুক্ত করার জিহাদকে হারাম বলছে, আর যারা সেখানে লড়াই করে জীবন দান করছে তাদের মৃত্যুকে অবৈধ মৃত্যু বলে আখ্যায়িত করছে।" পূর্ণ শক্তিতে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, বিবৃতি এবং সরকারী মৌলবী সাহেবদের মাধ্যমে এই অপবাদ ছড়িয়ে দেয়া হয়। অত্যন্ত লজ্জাহীনভাবে আমার ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে নিত্য নতুন মিথ্যা ও বানোয়াট কথা রচনা করে প্রচার করা হয়। এই মিথ্যাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার জন্যে জামায়াতের পত্রিকাগুলোকে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়, যাতে করে তাদের এই মিথ্যার খণ্ডন ও প্রতিবাদ করে দেয়া আমাদের কোনো বিবৃতি জনগণের

---

১৭. এই ফর্মূলা সর্বপ্রথম ১৯৪৮ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লাহোর ল'কলেজের বক্তৃতায় পেশ করা হয়। 'ইসলামী কানুন' শিরোনামে আটত্রিশ পৃষ্ঠার এই বক্তৃতাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। 'ইসলামী আইন' নামে এটি বাংলায়ও অনূদিত হয়েছে। 'উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে বক্তৃতাটি সংযোজিত হয়েছে। — অনুবাদক

কাছে পৌঁছুতে না পারে। কয়েক মাস এভাবে পরিবেশকে উপযোগী করে নেয়ার পর ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে আমাকে এবং আমার দুজন সাথীকে বন্দী করা হয়। জামায়াত কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা "মাওলানা মওদূদী নযরবন্দী কেন?" তে এই ষড়যন্ত্রের লজ্জাকর কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বাহ্য দৃষ্টিতে এটা ছিলএকটা বিরাট ষড়যন্ত্র। দর্শকরা মনে করছিল, এই ষড়যন্ত্রের জোরে পাহাড় পর্যন্ত টলে যাবে। কিন্তু অল্পকাল পরেই প্রমাণ হলো, শয়তানের ষড়যন্ত্র অতি দুর্বল। বছরটি শেষ হতে না হতেই মুসলমান জনগণ সেই দাবীর ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল, যা বছরের সূচনাতে পেশ করা হয়েছিল আর ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে আইন পরিষদকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আদর্শ প্রস্তাব পাশ করতে বাধ্য হতে হয়। জামায়াতে ইসলামী এটা দাবী করেনা যে, এই সাফল্য কেবল তার নিজের শক্তিতেই অর্জিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এতে দেশের সকল ইসলামী দল ও ইসলামপ্রিয় লোকদের শক্তিও শরীক ছিল। এতে ঐ লোকদেরও অংশ ছিল, যারা তখনো জামায়াতের বন্ধু ছিলেননা, আজো নেই। কিন্তু কে এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারে যে, এর আসল উদ্যোক্তা জামায়াতে ইসলামীই ছিল এবং জামায়াতের মতো সুসংগঠিত শক্তি যদি এর পিছে না থাকতো তবে সময় সময় বিক্ষিপ্তভাবে উত্থিত ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার দাবী একটি নিয়মতান্ত্রিক উদ্যম ও আন্দোলনের রূপ ধারণ করা এবং সেটাকে সাফল্যের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না? এই সত্য সম্পর্কে সেই সব লোকও অবগত আছেন, যারা এই প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে কিছুনা কিছু কাজ করেছেন। আর সেই ক্ষমতাসীনরাও অবগত আছেন, যাদেরকে এর সামনে মাথা নত করতে হয়েছিল।

আদর্শ প্রস্তাব ও তার প্রভাব

যারা রাজনৈতিক বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেননা, তারা সম্ভবত আজও এটা অনুমান করতে পারেননি যে, জামায়াতে ইসলামীর পদক্ষেপ কতোটা গুরুত্বপূর্ণ, জরুরী ও সময়োপযোগী ছিল। এখন যদি তার গুরুত্ব এবং তার দীর্ঘকালীন সুফলের কথা বলিও, তবে তা তাদের বুঝে আসবেনা। কিন্তু খোদা না করুন, আমরা যদি সেই পদক্ষেপে ব্যর্থ হতাম এবং দেশে শাসনতান্ত্রিকভাবে ধর্মহীন (সেক্যুলার) আদর্শকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি বানাবার সিদ্ধান্ত হয়ে যেতো, তবে আমাদের ভাইয়েরা জানতে পারতেন, এখানে ইসলামের পতাকাবাহীদের ভবিষ্যত কতোটা বিপজ্জনক? এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ যে, এই সদ্যজাত রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক উদ্দেশ্য তো কমপক্ষে ইসলামী আইনের ভিত্তিতে তৈরী হয়েছে এবং শাসনতন্ত্রের দিক থেকে কুফরীর পরিবর্তে ইসলামের পজিশন মজবুত

হয়েছে। এটাও আল্লাহর অনুগ্রহ যে, জনমত পুরোপুরিভাবে এই শাসনতান্ত্রিক পজিশনের সমর্থনে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছে এবং কোনো প্রকার প্রতারণার মাধ্যমে এই জনমত পরিবর্তন করা সহজসাধ্য ছিলনা।[১৮]

আদর্শ প্রস্তাব পাশ হবার সুফল কেবল এটাই ছিলনা যে, মুসলিম জাতি এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট হয়েছে এবং তা এমন একটি মজবুত শাসনতান্ত্রিক রূপলাভ করেছে যা পরিবর্তন করা এখন আর সম্ভব নয়, বরঞ্চ এর আরেকটি এবং তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সুফল এই হয়েছে যে, পাকিস্তান আদর্শিক দিক থেকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছে। এই দ্বিতীয় সুফলের গুরুত্ব সেই সব লোক এখনো উপলব্ধি করতে পারেননি, যারা শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে জ্ঞান রাখেননা। একারণেই আজ পর্যন্ত তারা এ জিনিসটিও বুঝতে পারেননি যে, আদর্শ প্রস্তাব গৃহীত হবার ফলে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এদেশের মর্যাদার মধ্যে কি মৌলিক তারতম্য সূচিত হয়েছে? কিন্তু আমরা যেহেতু সকল শাসনতান্ত্রিক ও শরয়ী দিক পর্যালোচনা করার পর ভালভাবে বুঝে শুনে এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম, সেজন্যে আমাদের কাছে কেবল এর রাজনৈতিক ও নৈতিক ফলাফলই নয়, বরঞ্চ আইনগত ও শরয়ী ফলাফলও সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিল। একারণে প্রস্তাবটি পাশ হবার সাথে সাথেই জামায়াতে ইসলামী সেদিকে নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং স্বীয় গঠনতন্ত্র, পলিসি ও কর্মপন্থায় এ পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করে দেয়, যা দেশের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য ছিল।

এ বিষয়টি যেহেতু বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার এবং যেহেতু তা আমাদের আন্দোলনের পথকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়, সেজন্যে এ বিষয়ে আমি কিছুটা আলোকপাত করবো, যাতে করে যারা বুঝ বুদ্ধি রাখেন, তারা সে বিষয়টিকে এবং আমাদের আন্দোলনের পরবর্তী গতি সম্পর্কে ভালভাবে জেনে নিতে পারেন।

ইসলামী রাষ্ট্র এবং অনৈসলামী রাষ্ট্রের পার্থক্য

যে রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিতভাবে সংকলন করা হয়নি, তার ইসলাম বা কুফরকে নির্ণয় করার প্রশ্ন তো কিছুটা জটিল বটে, কিন্তু একটি লিখিত শাসনতন্ত্রের অধিকারী রাষ্ট্রের বিষয়টি তো সম্পূর্ণ স্পষ্ট। কেননা, তার শাসনতন্ত্রই সাক্ষ্য দেয় যে, সেটি একটি মুসলিম রাষ্ট্র বা কাফির রাষ্ট্র। কোনো

১৮. ১৯৫৮ সালের 'মার্শাল ল' এর সময় শাসনতন্ত্র রহিত করে দেশের নাম থেকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' শব্দটি বর্জন করা হয়। কিন্তু ১৯৬৩ সালে পুনরায় শাসক গোষ্ঠী এ নাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র যদি সে রাষ্ট্রকে কুফরী রাষ্ট্র হবার ব্যাপারে অকাট্যভাবে সাক্ষ্য দেয়, তবে তার শাসক ও কর্মচারীদের মধ্যে কেবলমাত্র মুসলিম নামধারী লোকদের দেখে কিংবা তাদের ইসলামের দাবীতে পরিপূর্ণ বক্তৃতামালা শুনে সে রাষ্ট্রকে মুসলিম রাষ্ট্র হবার ফায়সালা করা যেতে পারেনা, এবং সে রাষ্ট্রের সাথে ঐরূপ আচরণও করা যেতে পারেনা, শরয়ীভাবে যা কেবল একটি মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে করা যেতে পারে। এর উদাহরণ হচ্ছে ঠিক সে রকম, যেমন কোনো ব্যক্তি যদি নিজ মুখে নিজের মুসলমান হবার কথা অস্বীকার এবং অমুসলিম হবার কথা স্বীকার করে, তবে এক্ষেত্রে তার মুখে দুএকটি ইসলামী ধ্যান ধারণার কথা এবং তার জীবনে দুএকটি ইসলামী চিহ্ন দেখে তাকে মুসলমান বলে স্বীকার করা, নামাযে ঈমাম বানানো কিংবা কোনো মুসলিম মেয়েকে তার কাছে বিয়ে দেয়ার বৈধতা স্বীকার করা আমদের জন্যে সম্ভব নয়। একইভাবে তাকে মুসলিম গণ্য করে সকল ব্যাপারে তার সাথে মুসলমানের মতো আচরণ করাও সম্ভব নয়, যতোক্ষণ না সে নিজ মুখে নিজেকে মুসলমান হবার সাক্ষ্য দিবে। একটি অনৈসলামী শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের অবস্থাও অনুরূপ। যতোক্ষণ না তার শাসনতন্ত্রের ভাষা ইসলামের সাক্ষ্য প্রদান করবে, ততোক্ষণ আমরা তাকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র বলতে পারিনা এবং তার সাথে সেই সম্পর্কও প্রতিষ্ঠা করতে পারিনা, যে সম্পর্ক শরয়ীভাবে কেবলমাত্র একটি ইসলামী রাষ্ট্রের সাথেই রাখা যেতে পারে, চাই তার সকল নাগরিক মুসলমান এবং তার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী মুসলমান হোকনা কেন?

নিখিল ভারতে আমাদের অবস্থান

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে নিখিল ভারতে যে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তার শাসনতন্ত্র ছিল একটি কুফরী ভিত্তিক শাসনতন্ত্র। সেই শাসনতন্ত্রে ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ পর্যন্ত বর্তমান ছিলনা। একারণে আমাদের আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সেই রাষ্ট্রের সকল সরকারী চাকুরীকে অবৈধ মনে করতাম। তার আইন কানুনকে বৈধ আইন কানুন বলে স্বীকার করতামনা। তার আদালতসমূহে জজ, উকিল কিংবা বাদী হিসেবে উপস্থিত হওয়াকে শরয়ীভাবে নিষিদ্ধ মনে করতাম। তার আইনসভার সদস্যপথ গ্রহণ এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করাকে ইসলামের বিপরীত মনে করতাম। আমাদের আকীদা ছিল এই যে, এধরনের রাষ্ট্রে নিশ্বাস গ্রহণ করাও একজন মুসলমানের জন্যে বৈধ নয়। তবে তখনই বৈধ হতে পারে, যখন সে ঐ রাষ্ট্রকে 'দারুল ইসলাম' বানাবার চেষ্টা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করবে। আর এই চেষ্টা সংগ্রামের উদ্দেশ্যে সে দেশে

অবস্থানকালেও আমরা তার প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ও আইন কানুনের সাথে কেবল ততোটুকু সম্পর্ক রাখাকেই বৈধ মনে করতাম, যতোটা সম্পর্ক সমকালীন পরিবেশে একটি রাষ্ট্রে বেঁচে থাকার এবং দীন ইসলাম কায়েম করার কাজ করার জন্যে একান্ত অপরিহার্য। অধিকন্তু, ঐ রাষ্ট্রকে 'দারুল ইসলামে' পরিণত করার চেষ্টা সংগ্রামও আমরা ঐসব পন্থায় করতে পারছিলাম না, যাকে সমকালীন পরিভাষায় 'শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি' বলা হয়। কারণ আমাদের দৃষ্টিতে এই ধরনের রাষ্ট্রে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা শরীয়তের দিক থেকে সঠিক ছিলনা। এজন্যে তখন আমরা 'শান্তিপূর্ণ অলুক্কায়িত বিপ্লবের দাওয়াত' এর পদ্ধতি অবলম্ব করেছিলাম।

১৯৪৭ সালে যখন রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হলো, এবং তার ফলশ্রুতিতে যখন পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হলো, তখন একটি শক্ত জটিল অবস্থা দেখা দিলো।

পাকিস্তানের অবস্থা ছিল এই যে, এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী ছিল মুসলমান, যারা সাধারণভাবে নিজেদের এই জাতীয় রাষ্ট্রটিকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে দেখার আকাংখী ছিল আর ইসলামী রাষ্ট্র নির্মাণ ও রূপায়িত করার কাজে আমরা জাতির পূর্ণ সহযোগিতা করবো, এটা ছিল জাতির আকাংখার সাথে সামঞ্জস্যশীল।

দেশের শাসনতন্ত্র হুবহু সেই কুফরী শাসনতন্ত্রই ছিল, যা রেখে গিয়েছিল সাবেক ইংরেজ সরকার। একারণে শরয়ী দিক থেকে এই নতুন রাষ্ট্রটির অবস্থা পূর্বের অনৈসলামী রাষ্ট্রের চাইতে ভিন্নতর ছিলনা এবং তার সাথে পূর্বের তুলনায় ভিন্নতর নীতিও গ্রহণ করার মতো ছিল না।

জনগণের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি আইন পরিষদ বানিয়ে দেয়া হয়। দেশের স্থায়ী শাসনতন্ত্র কী হবে তা চূড়ান্ত করাই ছিল এ পরিষদের কাজ। আর শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে কেবলমাত্র এই পরিষদই এটা চূড়ান্ত করার বৈধ কর্তৃপক্ষ ছিল। কিন্তু তারা সাবেক শাসনতন্ত্রে কোনো মৌলিক রদবদলও করেনি (অথচ আংশিক রদবদল অনেক কিছুই করেছে এবং করতে থেকেছে) আর ভবিষ্যতের ব্যাপারেও একথা প্রকাশ করেছে যে, তারা নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা কোন্ সব নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠা করতে চায়?

এটাই ছিল সেই জটিলতা, অবশেষে আদর্শ প্রস্তাব যেটাকে দূরীভূত করে দেয়।

নীতিগতভাবে যে রাষ্ট্রের একটি লিখিত শাসনতন্ত্র থাকে, সে রাষ্ট্রে কেবল তার আইন পরিষদ কিংবা সেই পর্যায়ের ক্ষমতার অধিকারী কোনো পরিষদই

সেই শাসনতান্ত্রিক মুখপাত্র হতে পারে, যার থেকে ইসলামের সাক্ষ্য আদায় হবার পর তাকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেয়া যেতে পারে। আমাদের নবজাত রাষ্ট্র যখন স্বীয় শাসনতান্ত্রিক ভাষায় এই সাক্ষ্য আদায় করলো, তখন যেদিন সাক্ষ্যটি আদায় হলো, ঠিক সেদিনই জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শুরা তাকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করে নেয়, এবং তার চব্বিশ দিন পরে গোটা শাসনতান্ত্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করে ঘোষণা করে যে, এখন এই রাষ্ট্রের শরয়ী মর্যাদা সাবেক অমুসলিম রাষ্ট্রের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এখন এ রাষ্ট্রের চাকুরী বৈধ। সদ্য প্রস্তাবিত ধরন অনুযায়ী তার আইন গ্রহণযোগ্য। তার আদালতে যাওয়া বৈধ। তার পার্লামেন্টের নির্বাচনে সর্বাবস্থায় অংশ গ্রহণ করা যেতে পারে। এই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের সাথে সাথে জামায়াতে ইসলামীও তার পলিসিতে এই পরিবর্তন নিয়ে আসে যে, ভবিষ্যতে সে এদেশের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে শাসনতান্ত্রিক পন্থায় তাকে পূর্ণাংগ 'দারুল ইসলাম' বানাবার চেষ্টা করে যাবে।

আমাদের আন্দোলনের ইতিহাসে এ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবের চিহ্ন, যা আমাদের জন্যে একটি কর্মপদ্ধতির দরজা খুলে দেয়। এখন একটি নিয়মতান্ত্রিক ইসলামী দেশ হয়ে যাবার পর এটি আর শত্রু রাষ্ট্র থাকলোনা, যার বিরুদ্ধে আমাদেরকে সংগ্রাম করতে হতো। বরঞ্চ এখন এটি আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র হয়ে গেলো, আমাদের নিজেদের ঘরে পরিণত হয়ে গেলো, যার বিনির্মাণ, সুগঠন ও উন্নতি সাধন করা আমাদের দায়িত্ব হয়ে পড়ে।

নতুন কর্মসূচী

এই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের পর থেকে জামায়াতে ইসলামী যে কর্মসূচীর ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে, তা চারটি বড় বড় উদ্দেশ্য সম্বলিতঃ

এক, এই রাষ্ট্রকে এমনসব চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের প্রবণতা থেকে বাঁচাতে হবে, যেগুলো তাকে ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে।

দুই, জনগণের মানসিক ও নৈতিক সংশোধন করতে হবে। যাতে করে আমাদের সমাজ জাহিলিয়াতের ভিত থেকে সরে এসে ইসলামের সৎ বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং এতোটা যোগ্য হয়ে উঠে যে, তার মধ্যে সকল প্রকার দুষ্কৃতি অবদমিত হয়ে যায় এবং সকল প্রকার সুকৃতি বিকশিত হবার সুযোগ পায়।

তিন, আমাদের এই নতুন দেশটি যেন অনিবার্যভাবে সেইসব বুনিয়াদের উপর নির্মিত হয়, যা নির্ধারণ করে দেয়ো হয়েছে আদর্শ প্রস্তাবে এবং এমন কোনো প্রচেষ্টা যেন চলতে না পারে, যা আদর্শ প্রস্তাবকে পদদলিত করে এখানে একটি অনৈসলামী ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

চার, শাসনতান্ত্রিক উপায়ে যেন দেশের বর্তমান নেতৃত্বকে একটি সৎ নেতৃত্বে পরিণত করা যায় এবং এই শাসনতন্ত্রকে কার্যকর করে আইন কানুন, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, অর্থসম্পদ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, জনকল্যাণ, প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্রনীতিতে এমনসব সংশোধন করা যায়, যাতে করে পাকিস্তান বিশ্বের বুকে ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্বশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

এইসব উদ্দেশ্যের প্রতিটিকে বাস্তবায়িত করার জন্যে আমরা যে কাজ করছি, তার ভিত্তিতে আমাদের কর্মসূচীকে বিভক্ত করা কঠিন। কারণ এই উদ্দেশ্যগুলো একটি আরেকটির সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত এবং এগুলোর কোনোটির জন্যেই পৃথকভাবে এমন কোনো কাজ করা যেতে পারেনা যদ্বারা অন্যান্য উদ্দেশ্যের পক্ষেও কিছু না 'কিছু কাজ হবে। তা সত্ত্বেও এখানে প্রতিটি উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী সম্পর্কে কিছুটা ব্যাখ্যা দিয়ে আমরা বুঝাতে চেষ্টা করবো, তা বাস্তবায়নের জন্যে আমরা কী কাজ করছি এবং ভবিষ্যতে কী করতে চাই?

পয়লা উদ্দেশ্য

ভ্রান্ত মতবাদের আন্দোলনসমূহের মধ্যে জামায়াত কেবল দুটি বড় ও মৌলিক মতবাদের দিকে দৃষ্টি আরোপ করেছে। আর ছোট গুমরাহীগুলো তো

আসলে বড় গুমরাহীগুলোর লেজুর মাত্র। সেগুলো হলো ছিন্নমূল। তাদের নিজেদের কোনো মূল নেই। ওরা কোনো না কোনো নিকৃষ্ট জাতের গাছের শিকড় থেকে জীবিকা আহরণ করছে এবং তাদের আশ্রয়ে বেঁচে রয়েছে। এজন্যে জামায়াত সেগুলোর প্রতি কোনো বিশেষ মনোযোগ আরোপ করেনি। অবশ্য এরা সকলেই সেই বিপদ অনুমান করছে, জামায়াত সফল হলে যা তাদের উপর আপতিত হতে পারে। একথা জামায়াতের কাছে স্পষ্ট যে, এখানে ইসলামের মূল প্রতিবন্ধক দুটি শক্তি।

প্রতিবন্ধক শক্তিসমূহঃ (১) সমাজতন্ত্র

এর মধ্যে একটি হলো সমাজতন্ত্র। এর পাকিস্তানী পতাকাবাহীরা খুব শক্তিশালী না হলেও এর পিছে রয়েছে একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলন, এক বিরাট সাহিত্যভাণ্ডার এবং বড় একটি সামরিক শক্তি। এ জিনিসগুলোই এটাকে আমাদের জন্যে এক নম্বর বিপদ বানিয়ে দিয়েছে। এ মতবাদ দ্বারা কেবল স্পষ্ট সমাজতন্ত্রীরাই প্রভাবিত হয়নি, বরঞ্চ এটা একটা শক্তিশালী বিষের মতো গোটা সামাজ পরিবেশে অনুপ্রবেশ করেছে। ছাত্র, শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী, সামরিক অফিসার, আমলা, দরিদ্র জনসাধারণ, শ্রমিক, কৃষক এমনকি অনেক ধর্মীয় নেতাও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই মতবাদ দ্বারা পরাজিত, প্রভাবিত ও আসক্ত হয়েছে। এই আধা সমাজতন্ত্রীদের সংখ্যাও কারো জানা নেই এবং এদের প্রকারভেদও অগণিত। এদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক এমন লোকও রয়েছে যারা সমাজতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রীদেরকে অভিশাপ দেয় বটে, কিন্তু নিজেরা চিন্তা করে সমাজতন্ত্রের মস্তিষ্ক দিয়ে, কথা বলে সমাজতন্ত্রের ভাষায় এবং কুরআন হাদীস থেকে পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের সূত্র বের করার চেষ্টা চালায়।

(২) পাশ্চাত্য ধর্মদ্রোহিতা, পাপাচার ও সীমালংঘন

দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক হলো পাশ্চাত্য ধর্মদ্রোহিতা, পাপাচার এবং বৈধ অবৈধের একাকারনীতি। আমাদের দেশে এগুলোর বয়স দেড়শ' বছর। ইংরেজদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতি দীর্ঘকালব্যাপী এগুলোকে দুধ কলা খাইয়ে প্রতিপালিত করেছে। ইংরেজরা যাবারকালে এগুলোকে নিজেদের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ক্ষমতাসীন করে গেছে। তাছাড়া এগুলো এখানে পাশ্চাত্য শক্তির পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করছে। অতপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এগুলোর এবং সমাজতন্ত্রের মাঝে যতোই পার্থক্য থাকুক না কেন, তা সত্ত্বেও এরা উভয়ে কিন্তু একই মাতৃ সভ্যতার কন্যা। ধর্মদ্রোহিতা, পাপাচার এবং বৈধ অবৈধকে একাকার করে ফেলার ব্যাপারে এই সমাজতন্ত্রী ও অসমাজতন্ত্রী দুই

বোনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একারণে প্রকৃত ইসলামকে বাস্তবায়িত ও প্রতিষ্ঠিত করবার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কাজে এরা ঐক্যবদ্ধ। এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা হলো, এখানে 'ইসলাম' এর নামে এমন একটি সভ্যতা সংস্কৃতির প্রচলন করতে হবে, যা তার কোনো বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেই আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সভ্যতা সস্কৃতি থেকে ভিন্নতর হবেনা এবং যাতে ইসলামের নির্ধারিত সীমাসমূহের কোনোটিই প্রতিষ্ঠিত থাকবেনা।

উলামায়ে কিরাম

জামায়াতে ইসলামীর মূল সংঘাত উপরোক্ত দুটি শক্তির সাথেই। এর মধ্যে উলামায়ে কিরাম অহেতুক এসে দাঁড়িয়েছেন, কিংবা তাদেরকে এনে দাঁড় করানো হয়েছে।

প্লাবন দিয়ে প্লাবনের মোকাবিলা

কোনো সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলন স্থবির প্রস্তরভূমি দ্বারা প্রতিরোধ করা যায়না। কেবলমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী একটি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিপ্লব দ্বারাই তা প্রতিরোধ করা যেতে পারে। আমাদের এখানে এযাবত প্লাবনের মোকাবিলা করা হয়েছে অসাড় পাথর দিয়ে। একারণে আমাদের দেশসহ প্রায় সবগুলো মুসলিম দেশ পাশ্চাত্য চিন্তা ও সংস্কৃতির সয়লাবে নিমজ্জিত হতে চলেছে। এখন আমরা আন্দোলনের মোকাবিলা আন্দোলন দিয়ে এবং বন্যার মোকাবিলা প্রতিবন্যা দিয়ে করছি। আমরা আশা করি, প্রতিটি হারানো ভূখণ্ড উদ্ধারে আমরা সক্ষম হবো। আমাদের আন্দোলন কেবল কোনো একটি দিক বা ময়দানে এসব গুমরাহীর মোকাবিলা করছেনা। বরঞ্চ প্রতিটি ময়দানে আমাদের এবং তাদের মধ্যে তুমুল সংঘাত চলছে। আমরা তাদের সমস্ত আদর্শিক ও বাস্তব পথ ও পন্থার সমালোচনা করেছি। তাদের সমস্ত দুর্বলতার ঢাকনা খুলে সামনে রেখে দিয়েছি। আমরা মানব জীবনের সকল বিষয়ে তাদের সমাধানের বিকল্প সমাধান পেশ করেছি এবং যুক্তি প্রমাণ দিয়ে আমাদের সমাধানকেই সঠিক প্রমাণ করেছি। তাদের সাহিত্যের বিপরীতে আমরা একটি কল্যাণধর্মী সাহিত্য উপস্থাপন করেছি। তাদের দর্শনের বিপরীতে আমরা একটি উত্তম দর্শন পেশ করেছি। তাদের রাজনীতির চাইতে অধিকতর মজবুত রাজনীতি আমরা নিয়ে এসেছি। আমাদের এই আন্দোলনের কাতারে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্যে কেবলমাত্র 'ক্বালাল্লাহু ওয়া ক্বালার রাসূল' জানা লোকেরাই নাই, বরঞ্চ সেই সাথে 'ক্বালা হেগেল', 'ক্বালা মার্কস' এবং 'ক্বালা ফ্রয়েড' জানার লোক ও তাদের সমতুল্যই রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যেখানে তাদের দর্শন ও সংস্কৃতি

প্রসারের লোক বর্তমান রয়েছে, সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী দর্শন ও সংস্কৃতি প্রচারের জন্যে আমাদের লোকও বর্তমান রয়েছে। রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগে তাদের বিষ ছড়ানোর লোকেরা যদি নিজেদের কাজ করে থাকে, তবে আমাদের প্রতিষেধকের বাহকরাও চুপচাপ বসে নেই। যদিও আমাদের এই লোকদেরকে বের করে দেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের সকলকে বেছে বেছে বাইরে নিক্ষেপ করা এখন আর কারো সাধ্যের আওতায় নেই। ইনশাআল্লাহ অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে দেবে, একটি গতিমান জীবনব্যবস্থার সমর্থকদের বেছে বেছে ছাটাই করে ফেলা কেবল কোনো বেয়াকুফই সম্ভব মনে করতে পারে। কারণ সমাজের প্রতিটি স্তরে তাদের প্রভাবের মোবিলায় আমাদের প্রভাবও কম বেশী কার্যকর রয়েছে। কৃষক, মজুর এবং শ্রমজীবি মানুষ যারা এতোদিন পর্যন্ত তাদের ইজারায় বন্দী ছিল, এখন ক্রমশ তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের প্রভাব গ্রহণ করছে এবং ইসলাম বিরোধী চিন্তা চেতনা এবং চরিত্র ও আচরণের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী জনমত তৈরী হতে চলেছে। সর্বোপরি নেতৃত্ব বিপ্লবের জন্যে আমাদের আন্দোলনের আঘাত সরাসরি ঐ নেতৃত্বের উপর পড়ছে, যার আশ্রয়ে এখানে কেবল ফিরিংগীপনাই নয়, অন্যসকল ছোট বড় গুমরাহীও প্রতিপালিত হচ্ছে। এই সংঘাতের একটি বিশেষ দিকও রয়েছে। তা হলো এই যে, এর উভয় পক্ষ শুধু নিজ নিজ মতাদর্শেরই প্রতিনিধিত্ব করছেনা, বরঞ্চ তাদের নিজ নিজ মতাদর্শপ্রসূত বিশেষ চরিত্রেরও প্রতিনিধিত্ব করছে। একদিকে সমাজতন্ত্রীরা যদি তাদের সমাজতান্ত্রিক চরিত্র ও ফিরিংগীপন্থীরা ফিরিংগী চরিত্র নিয়ে ময়দানে বর্তমান থেকে থাকে, তবে অপর দিকে জামায়াতে ইসলামীও কেবল বই, বক্তৃতা আর সামাজিক কার্যক্রম নিয়ে সামনে আসেনি, বরঞ্চ ব্যক্তিগত ও দলীয় নৈতিক চরিত্রও সাথে নিয়ে এসেছে, যা ইসলামের পরিপূর্ণ না হলেও অন্তত সঠিক প্রতিনিধিত্ব অবশ্যি করছে। যেখানেই এর প্রভাব পৌছুচ্ছে, সেখানেই ইসলামী ধ্যান ধারণার সাথে সাথে ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইসলামী চালচলনের প্রদর্শনী করা হচ্ছে পূর্ণ গৌরবের সাথে মাথা উঁচু করে। সেই সাথে সাথে দূর হচ্ছে ঐ পরিবেশ পরিস্থিতি, যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে আধুনিক সোসাইটিতে একজন লোক নামায পড়তে লজ্জাবোধ করতো এবং একজন মহিলা অন্ধ আধুনিকতার ভ্রুকুঞ্চনের ভয়ে বোরকা ও ওড়না পড়তে কুণ্ঠাবোধ করতো।

১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে এসব গুমরাহী প্রতিহত করার জন্যে আমরা পূর্বের গ্রন্থাবলীর সাথে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলোও সংযোজন করিঃ

১. সুদ ২য় খণ্ড[১৯]
২. ভূমি মালিকানার বিধান
৩. জাতীয় মালিকানা
৪. পাকিস্তানী আওরাত দু-রাহে পর

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য

আমাদের কর্মসূচীর দ্বিতীয় মৌলিক উদ্দেশ্যের কথা আগেও বলে এসেছি। সেটা হলো, "সর্বসাধারণ মানুষের মানসিক ও চারিত্রিক সংশোধন করতে হবে, যাতে করে আমাদের সমাজ জাহিলিয়াতের ভিত থেকে সরে এসে ইসলামের কল্যাণমুখী বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এতোটা যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়, যাতে করে দুষ্কৃতি দমিত এবং সুকৃতি বিকশিত হয়।"

রোগ নির্ণয়

এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে আমরা যে কর্মসূচী নিয়ে কাজ করছি, তা যথার্থভাবে অনুধাবন করার জন্যে বর্তমান মুসলিম সমাজের যেসব রোগ আমরা নির্ণয় করেছি তা সঠিকভাবে বুঝে নেয়া আবশ্যক। কেননা আমরা যে রোগ নির্ণয় করেছি, তা অনুধাবন করতে সক্ষম না হলে তা নিরাময়ের জন্যে যে ঔষধ নির্ধারণ করেছি তা বুঝা কঠিন হবে। তা সঠিকভাবে অনুধানব করা ছাড়া, আমাদের কর্মীরাও ঔষধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে কাজ করতে পারবেনা। তাছাড়া বাইরে থেকে যারা আমদের কাজ দেখছেন, তারাও ততোক্ষণ পর্যন্ত সঠিক রায় প্রতিষ্ঠা করতে পারবেনা, যতোক্ষণ না তারা জানতে পারে যে, সেই রোগ কি যার আমরা চিকিৎসা করতে চাই?

কোন্ ধরনের লোক নিয়ে বর্তমান মুসলিম সমাজ গঠিত

আমাদের দৃষ্ঠিতে, আমাদের বর্তমান মুসলিম সমাজ ভিন্ন ভিন্ন তিন শ্রেণীর লোক দ্বারা গঠিত।

এক শ্রেণীর লোক হলো তারা, যারা হয়তো মন মানসিকতার দিক থেকে ইসলাম থেকে দূরে অবস্থান করছে, কিংবা নৈতিক চারিত্রিক দিক থেকে ইসলামের আনুগত্য অনুসরণ করতে রাজী নয়, অথবা স্বার্থগত কারণে তারা

১৯. উভয় খণ্ড এখন উর্দু ভাষায় 'সুদ' এবং বাংলা ভাষায় 'সুদ ও আধুকি ব্যাংকিং' নামে একত্রে প্রকাশ করা হয়েছে।

চাচ্ছে, এখানে প্রকৃত ও পূর্ণ ইসলাম বাস্তবায়িত না হোক। এই লোকেরা ছোট বড় অনেক দলে বিভক্ত।

এদের মধ্যে কিছু আছে নিরেট নাস্তিক। এরা বুঝে শুনে ইসলাম বিরোধী মতবাদে ঈমান এনেছে। অনৈসলামী মূল্যবোধকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে। এরা স্বীয় ধর্মাদ্রোহিতার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে এবং ইসলামের নাম দিয়ে ধোকা দেয়না। অবশ্য কিছুটা ধোকাবাজী তাদের মধ্যেও রয়েছে। আর তা হলো, তারা নিজেদের ইসলামী নাম পরিবর্তন করেনি এবং মুসলমান সমাজের সাথে তাদের বাহ্যিক সম্পর্কও ছিন্ন করেনি। তবে তারা নিজেদেরকে ইসলামের পতাকাবাহী বলে জাহির করেনা এবং নামের সাথে 'ইসলামের মুফাসসির' খেতাবও লাগায়না।

কিছু লোক আছে ধোকাবাজ নাস্তিক। তদের মন মগজ নিষ্ঠাবান নাস্তিকদের মতোই ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে। কিন্তু তারা নিজেদেরকে ইসলামের পতাকাবাহী এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী বলে দাবী করে, যাতে করে মুসলমানদের রাজনীতি ও নেতৃত্বে তারা সমাসীন থাকতে পারে এবং কর্তৃত্বের বাগডোর তাদের নিজেদের হাতেই থেকে যায়।

কিছু লোক আছে আধা নাস্তিক আধা মুসলিম। এরা ইসলামকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেনা বটে, তবে কুরআন ও সুন্নাহর আসল ইসলাম তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এই খাঁটি ইসলামের পরিবর্তে তারা নিজেদের মতমতো একটি নতুন ইসলাম রচনা করে সেটাকে আসল ইসলাম বানাতে চাইছে। এদের কেউ কুরআন নিয়ে খেলছে। কেউ কুরআন হাদীস উভয়টা নিয়ে তামাশা করছে। কেউ আবু জর গিফারী (রা)-কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। আর কারো কারো হাতে বেচারা শাহ্ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রহ) বিপদগ্রস্ত হচ্ছেন।

এমন কিছু লোক আছে, ইসলামের সাথে যাদের বিদ্রোহ চিন্তা ও আদর্শের ভিত্তিতে নয়, বরঞ্চ ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ হয়তো নৈতিক নীতিমালার ভিত্তিতে, নয়তো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে। ইসলাম এসে তাদের কামনা বাসনা এবং স্বেচ্ছাচারিতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করুক, তাদের হারামখুরী বন্ধ করে দিক এবং তাদের অর্থনৈতিক যুলুম নির্মূল করে তাদের আয় ব্যয়ের উপর পাহারা বসাক এটা তারা বরদাশত করতে পারেনা। এই শ্রেণীর লোকদের কেবল তখনই ইসলামের কথা স্মরণ হয়, যখন সমাজতান্ত্রিক মতবাদের আঘাতে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতে দেখে। এরূপ অবস্থায় তারা ইসলামকে নিজ পরিবারের পুরানো সেবক হিসেবে ডেকে বলতে থাকে, 'এসো এই আত্মসাতকারীকে মেরে তাড়িয়ে দাও।' কিন্তু এই ফরিয়াদের সময়ও তারা

আপন জীবনের অপরাপর কোনো বিষয়ে সেই 'খান্দানী সেবককে' কথা বলার অধিকার দেয়না। এই অবস্থায় যদি ইসলাম একটু আধটু মুখ খুলেও বসে, তবে সাথে সাথে সে বেচারা 'মোলাযিম' এর পরিবর্তে 'মোল্লাইজম' হয়ে যায়।

একদল লোক রয়েছে ধর্ম ব্যবসায়ী। ওদের সমগ্র কার্যক্রমের পরিমণ্ডল যে কাজগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ সেগুলো হলো, সাধারণ মুসলমানদেরকে তাদের দীন সম্পর্কে অজ্ঞ রাখা, মুশরিকানা ধ্যান ধারণায় নিমজ্জিত রাখা, সৃষ্টি এবং স্রষ্টার মাঝে একটি স্বাধীন মাধ্যম হিসেবে নিজেদের পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করে নেয়া এবং বাধা বন্ধনহীন ধর্মীয় জীবনের সাফল্যের জন্যে এবং সকল ধর্মীয় সীমারেখা উপেক্ষা করা স্বত্ত্বেও নাজাতের গ্যারান্টি লাভের জন্যে জনগণের দ্বারা চড়ামূল্যে তাদের রূহানী ফয়েজ ক্রয়ের ব্যবস্থা জারি রাখা।

এদের চাইতে ভিন্ন ধরনের আরেক দল ধর্ম ব্যবসায়ী রয়েছে। নিজেদের গদী এবং ছোট ছোট ধর্মীয় রাজত্ব রক্ষাই তাদের কাছে সবচাইতে বড় বিষয়। এদের প্রত্যেকে যেসব পুঁজিপতিও এবং খদ্দেরকে পূর্বসূরীদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, কিংবা নিজে কষ্ট করে যোগাড় করেছে, যেকোনো মূল্যে এদেরকে তারা স্বীয় ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত রাখতে চায়। এজন্যে দীন প্রতিষ্ঠার কোনো পূর্ণাংগ আন্দোলনকে বরদাশ্‌ত করা তাদের জন্যে খুবই কঠিন, সে আন্দোলন যতোই সঠিক ভিত্তির উপর উত্থিত হোক না কেন, যতোই শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত হোক না কেন এবং তাদের জ্ঞান ও বিবেক সেটাকে যতোই সঠিক বলে সাক্ষ্য দিকনা কেন। কারণ এরূপ আন্দোলন দেখার সাথে সাথেই তাদের আশংকা হয়, না জানি আমাদের এই পরিমণ্ডল ভেংগে সেই বড় পরিমণ্ডলের সাথে একাকার হয়ে যায় এবং আমাদের কেন্দ্রীকতা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এদের অধিকাংশ 'আহলে দীন' হযরতগণ 'আহলে দুনিয়ার' সাথে বিভিন্ন প্রকার সমঝোতা করে রেখেছে। দীন ও দুনিয়ার বিভক্তি এবং দীনের সীমাবদ্ধ ধারণাকে বড় বড় ধর্মীয় যাদুকরী যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। আর এই যুক্তি প্রমাণগুলোকে বিরাট বিরাট পবিত্র ও মুহতারাম ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের ব্যক্তিগত আমল সুদৃঢ় করে রেখেছে । তাদের কাছে এখন পর্যন্ত এই ধারণাই গ্রহণযোগ্য হয়ে আছে যে, সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে সেটা, যাতে দুনিয়াদার লোকেরা নিজেদের ইচ্ছা মাফিক যেভাবে চায় এবং যে রকম আইন কানুন ও নিয়মনীতি দ্বারা চায় দেশ চালাবে, তবে বিশ্বাসের সাথে ধর্মীয় বিধি বিধান পালন করবে, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সামনে বিশ্বাসের ট্যাক্স পেশ করবে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের দানশীলতার সাথে পৃষ্ঠপোষকতা করবে এবং ধর্মীয় চৌহদ্দির মধ্যে ধর্মীয় নেতাদের রাজত্ব মেনে চলবে। আর কোথাও যদি তারা

ইসলাম প্রতিপালনের জন্যে একটি ধর্মীয় নেতার পদ প্রতিষ্ঠা করে পারিবারিক আইনের সীমা পর্যন্ত বিচার ফয়সালার ক্ষমতা এবং ধর্মীয় ওয়াকফ্ ও মাদ্রাসা মক্তবের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্বে তাদের নিয়োগ করে, তবে মহাখুশীর সাথে তারা এটাকে একটা আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে দেয়। দীনের সেই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যদি সঠিক হয়, যার দৃষ্টিতে দীন ও দুনিয়ার মধ্যে পার্থক্য করণের প্রতিটি দৃষ্টিভংগি ও মতবাদ ভ্রান্ত, কাফির ও ফাসিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের সাথে সর্বপ্রকার আপোষকামিতা ভ্রান্ত এবং পূর্ণাংগ জীবনে দীনের পরিপূর্ণ কার্যকারিতা অপরিহার্য, তবে এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বিপরীত এযাবত তাদের যে ইলম ও আমল চলে আসছে তার বিশ্বস্ততা কিভাবে অক্ষুণ্ন থাকতে পারে? এই শ্রেণীর লোকদের জন্যে এখন এটাও একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই যে বিভিন্ন শ্রেণী, এদের পরস্পরের মধ্যে বিরাট মতপার্থক্য এবং মত–বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তাদের মতপার্থক্যকে কৃত্রিম বলে আখ্যায়িত করে আমরা তাদের কারো সাথেই বেইনসাফী করতে পারিনা। আসলে নিষ্ঠার সাথেই এরা একদল আরেক দলের সাথে মতপার্থক্যে লিপ্ত। আর তাদের কারো প্রতি এই অপবাদ দেয়া যেতে পারেনা যে, তাদের দৃষ্টিভংগি অপর দলের দৃষ্টিভংগির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এসব কিছু জানা ও স্বীকার করা সত্ত্বেও যে কারণে আমরা তাদের সবাইকে একদলভূক্ত বলে আখ্যায়িত করছি সেটা হলো, যখনই দীন প্রতিষ্ঠার কোনো আন্দোলন উত্থিত হয়, তখন এই সবশ্রেণীর লোকেরা তার বিরোধিতায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। অতীতের ইতিহাসেও একথা প্রমাণিত আর আজকের অভিজ্ঞতায়ও এটা প্রকাশ পাচ্ছে। এজন্যে দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে এরা সকলেই এক শ্রেণীভুক্ত।

পয়লা শ্রেণী

সংখ্যার দিক থেকে গোটা জাতির বিচারে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা খুবই কম, কিন্তু রাজনৈতিক শক্তি ও অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ এই উভয়টিই এদের মুষ্টিবদ্ধ। সাধারণ জনগণের বিরাট অংশ এদের পাতানো ফাঁদে ফেঁসে রয়েছে। মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে প্রতারিত করার জন্যে তাদের কাছে ভাওতাবাজির অনেক হাতিয়ার রয়েছে।

এই শ্রেণীর লোকদের সাথে আমাদের দুই ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। ব্যক্তি হিসেবে তারা সবাই আমাদের মানবভাই ও জাতীয়ভাই। তারা আমাদেরকে গালি দিলেও আমরা ব্যক্তি হিসেবে তাদের সম্মান করি। তাদের সাথে আমাদের ব্যক্তিগত কোনো বিবাদ নেই। বরঞ্চ, আমরা আন্তরিকভাবে তাদের কল্যাণকামী

এবং তাদের ধ্যান ধারণা সংশোধন হয়ে যাক ও আল্লাহ্ তায়ালা সত্যের জন্যে তাদের অন্তর খুলে দিন এব্যাপারে সাধ্যানুযায়ী আমরা চরম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু একটি শ্রেণী বা গোষ্ঠী হিসেবে তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ চলছে। যেহেতু গোষ্ঠী হিসেবে তারা দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পথ বন্ধ করছে। আমরা জানি, এই শ্রেণীর খুব কম লোকেরই নিঃস্বার্থ সত্য প্রীতির সৌভাগ্য হয়। নিজেদের নফসের সাথে সর্বোচ্চ জিহাদ করা ছাড়া তাদের পক্ষেও এই জিনিস অবলম্বন করা সম্ভব নয়। এজন্যে কেবল কিছু সৎ লোক পাওয়ার আশায় এই শ্রেণীর লোকদের সাথে বাস্তবতার বিপরীত আচরণ করা যেতে পারেনা। আর আল্লাহর প্রকৃত দীন প্রতিষ্ঠাকামীরা তাদের সাথে সমঝোতা ও সহাবস্থানও করতে পারেনা। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীটি দীন প্রতিষ্ঠার পথের কংকর। এদেরকে উৎখাত করা, জনগণকে এদের ক্ষমতার প্রভাব বলয় থেকে বের করা এবং তাদেরকে কর্তৃত্বের মসনদ থেকে বেদখল করা এমন একটি অপরিহার্য ভাংগার কাজ, যেটা ছাড়া কোনো গড়া ও সংস্কারের কাজ করা যেতে পারে না।

দ্বিতীয় শ্রেণী

দ্বিতীয় শ্রেণীটি ঐ সকল সৎ লোকের দ্বারা গঠিত যারা কম বেশী দীন সম্পর্কে জানে। আর যতোটুকুই জানে তা নিষ্ঠার সাথে পালন করে। তাছাড়া তারা এমন প্রতিটি জিনিসেরই আনুগত্য ও সহযোগিতা করার জন্যে প্রস্তুত থাকে, যা কুরআন সুন্নাহ্ দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত হবে। জাতির সব ধরনের লোকদের মধ্যেই এই শ্রেণীর লোকেরা বর্তমান আছে। গরীবদের মধ্যেও আছে, ধনীদের মধ্যেও আছে। প্রজাদের মধ্যেও আছে, শাসকদের মধ্যেও আছে। আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যেও আছে আর পুরানো ধাঁচের আলেমদের মধ্যেও আছে। যদিও সংখ্যার দিক থেকে এরাও কম, কিন্তু নৈরাশ্যজনক কম নয়। বরঞ্চ বাড়াবাড়ি না করেও আমরা বলতে পারি, প্রথম শ্রেণীর লোকদের তুলনায় এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের সংখ্যা অনেক বেশী। প্রকৃতপক্ষে এরাই জাতির মূল শক্তি। জাতির সংশোধনের যা কিছু আশা করা যায় তা এদেরই সাথে সম্পর্কিত। যাবতীয় অন্যায় ও দুষ্কৃতি সত্ত্বেও এখনো এই জাতির প্রতি আল্লাহর যতোটুকু অনুগ্রহ রয়েছে তার কারণ হলো এই যে, ধ্বংসের স্রোতের মধ্যেও এই বিরাট সংখ্যক নির্ভরযোগ্য লোক জাতির মধ্যে বর্তমান রয়েছে। আর তাদের হাতে কল্যাণ ও সততা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্বলতা দেখা যায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ অধ্যয়নের স্বল্পতা ও ত্রুটিজনিত কারণে দীনের সীমিত ধারণার মধ্যে নিমজ্জিত এবং ব্যাপক ও পূর্ণাংগ ধারণা গ্রহণে অসুবিধা অনুভব করে।

কেউ কেউ মৌলিক ও প্রাসংগিক জিনিসের মধ্যে পার্থক্যই বুঝেনা। অগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে এতোটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে যে, প্রকৃত গুরুত্বের অধিকারী বিষয়গুলো তাদের দৃষ্টিতে হালকা ও নগণ্য হয়ে আছে। কিছু লোকের দীনের বুঝ জ্ঞান ঠিকই আছে, কিন্তু তারা হয়তো এখনো পর্যন্ত নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানেনা, কিংবা তাদের মধ্যে কর্মশক্তির কমতি রয়েছে, অথবা তারা হতাশাগ্রস্ত, নয়তো তাদের স্বদেশে যে দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সংগ্রাম চলছে সেটাই তারা জানেনা, কিংবা এচেষ্টা সংগ্রাম যারা করছে তাদেরকে তারা এখনো সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে, অথবা তারা আশা করছে যে, সীমিত ধরনের সংশোধন প্রচেষ্টা দ্বারাই কাজ হয়ে যাবে।

আমাদের পুরো প্রচেষ্টা এইজন্যে নিয়োজিত রয়েছে যে, এই শ্রেণীর লোকদের যাবতীয় দুর্বলতা দূর হয়ে যাক, তারা জাগ্রত হোক, সংগঠিত হোক, আন্দোলনে নেমে পড়ুক এবং তারা আমাদের সাথে আসুক বা না আসুক, ইকামতে দীনের প্রচেষ্টায় তাদের সহযোগিতা আমরা বেশী বেশী লাভ করি।

তৃতীয় শ্রেণী

তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে সাধারণ মানুষ। আমাদের জাতির এরাই সর্ববৃহৎ অংশ। এরা আমাদের গোটা জনসংখ্যার শতকরা নব্বই শতাংশ বা তার চেয়েও বেশী। এরা ইসলামের প্রতি গভীর বিশ্বাস এবং ঐকান্তিক মহব্বত রাখে। ইসলামের নামে এরা সবার আগে জানমাল কুরবাণী করে আসছে এবং আজো করতে প্রস্তুত। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জিনিসই তাদের মধ্যে আবেদন সৃষ্টি করেনা। কোনো জিনিস যখন তারা ইসলামের খেলাফ বলে জানতে পারে, তখন তা বাধ্য হয়ে বরদাশত করলেও অন্তর দিয়ে কখনো সহ্য করেনা। কিন্তু এই দরিদ্র অসহায় লোকগুলোর মধ্যেও কিছু রোগ ছড়িয়ে আছে।

এদের সবচাইতে বড় এবং মৌলিক রোগ হচ্ছে এই যে, এরা যে ইসলামকে এতোটা মহব্বত করে, তার সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান তাদের নেই। তার সঠিক পরিচয় তারা জানেনা। কেবল বিস্তারিত রূপই নয়, মৌলিক এবং বুনিয়াদী বিষয়গুলো সম্পর্কেও তারা অজ্ঞ। একারণে যে কোনো ভ্রান্ত ও বিপথগামী লোক ইসলামের লেবাস পরে তাদের প্রতারিত করতে পারে। যে কোনো ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং ভ্রান্ত তরিকা ইসলামের নামে তাদের মধ্যে বিস্তার করতে পারে।

এদের দ্বিতীয় বড় রোগ হচ্ছে এই যে, একটা দীর্ঘ সময় থেকে তাদের নৈতিক প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা হয়নি। এরা স্বজাত গাছের মতো উৎপন্ন ও প্রতিপালিত হয়ে আসছে। ইসলামী নৈতিকতা তো দূরের কথা, মৌলিক মানবীয়

গুণাবলী পর্যন্ত তাদের মধ্যে সৃষ্টি করার কোনো চেষ্টা করা হয়নি। বরঞ্চ বিগত দেড় দুইশ বছরের গোলামী যুগে নৈতিক দিক থেকে ক্রমশ এরা অধপতনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে।

তদুপরি তাদের স্বজাতির বুদ্ধিজীবি ও প্রভাবশালী লোকেরা (যাদেরকে আমরা প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করেছি) এদের মধ্যে আরো অনেক নতুন নতুন রোগ ঢুকিয়ে দিয়েছে। এই অসহায় দরিদ্র লোকগুলো শিক্ষা অর্জনের জন্যে আধুনিক যুগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে গেলে সেখানে অধিকতর নিষ্ঠাবান এবং ধূর্ত ধর্মদ্রোহী কিংবা আধা মুসলিম ও আধা ধর্মদ্রোহী লোকদের পাল্লায় পড়ে। প্রাচীন পদ্ধতির মাদ্রাসাগুলোতে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মীয় ব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে। দীনি বিষয়ে জানতে চাইলে বক্তা এবং ওয়ায়েজদের বিরাট অংশ এদেরকে বিপথগামী করে ছাড়ে। রূহানী তরবিয়ত লাভ করতে চাইলে অনেক পীরই তাদের জন্যে আল্লাহর পথের ডাকাত প্রমাণিত হয়। দীনি জ্ঞানের উৎসগুলোর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে এমন সব পত্র পত্রিকার পাল্লায় পড়ে, যেগুলোর অধিকাংশই জাতির সবচাইতে নোংরা ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকদের দ্বারা পরিচালিত। জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়ে নেতৃত্বের জন্যে নেতা বানাতে চাইলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ধর্মবিদ্বেষী এবং আধা ধর্মদ্রোহী লোকদের দেখতে পায়। জীবিকার অন্বেষণে যখন তারা জীবিকার উৎসগুলোর দিকে ধাবিত হয় তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা এমন সব লোককে সেগুলো কুক্ষিগত করে রাখতে দেখতে পায়, যারা স্থায়ীভাবে হালাল হারামের পার্থক্যকে মিটিয়ে দিয়েছে। মোটকথা, আমাদের জাতির সেই শ্রেণীটি, যেটি মূলত কোনো জাতির হৃদপিণ্ড এবং মস্তিষ্ক, যাদের উপর নির্ভরশীল সে জাতির ভাংগা এবং গড়া, দুর্ভাগ্যবশত তারা এখন এমন একটি জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে, যারা জাতিকে গড়ার পরিবর্তে ভাংগার কাজে উতরে গেছে এবং গড়ার প্রতিটি সঠিক ও কার্যকর প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকে পরিণত হয়ে আছে।

ব্যবস্থাপত্র

বর্তমান মুসলিম সমাজের শ্রেণী বিন্যাস ও রোগ নির্ণয়ের এই বিশ্লেষণ যদি সঠিক হয়, তবে এখন এর নিরাময়ের জন্যে কি চিকিৎসা বিবেচনা করা যেতে পারে তা চিন্তা করে দেখুন। আমাদের মতে চিকিৎসার এছাড়া অন্য কোনো পন্থা নেইঃ

সমাজের সকল স্তর থেকে যতোটা সম্ভব দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে। তাদের মানসিক ও নৈতিক দুর্বলতাসমূহ দূর করার

জন্যে পূর্ণ প্রচেষ্টা নিয়োগ করতে হবে এবং তাদেরকে সংগঠিত করে সংস্কারের কাজে লাগাতে হবে।

তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ইসলামের যথার্থ জ্ঞান এবং ব্যাপক ও পূর্ণাংগ ধারণা অধিক থেকে অধিকতর ছড়িয়ে দিতে হবে। তাছাড়া তাদের মধ্যে মৌলিক মানবীয় গুণাবলী এবং ইসলামী গুণাবলী বিকশিত করার জন্যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

পূর্ণ হেকমত ও আন্তরিকতার সাথে প্রথম শ্রেণীর লোকদের বিবেকে আবেদন সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সংশোধনের কাঁচা ও অপরিপক্ক বিশ্বাসকে তাদের সাথে সম্পর্কিত করে জাতির বৃহত্তর অংশকে তাদের কব্জা ও প্রভাব থেকে বের করার প্রচেষ্টায় কোনো ভাবেই অবহেলা প্রদর্শন কিংবা অমনোযোগী হওয়া যাবেনা। আমাদের মতে, তাদের মিথ্যার ঝড়, ফতুয়ার ম্যাগজিন এবং রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নিষ্পেষণের ভয়ে পিছপা হওয়া, সম্মুখ সমর থেকে পলায়নের চাইতে কিছুমাত্র কম অপরাধ নয়।

সংস্কার কর্মসূচী

চিকিৎসার এই উপায় অনুধাবন করার পর আমাদের বাস্তব কর্মসূচী অনুধাবন করা কারো জন্যেই অসুবিধা হবার কথা নয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে আমরা জনগণকে ইসলামী রাষ্ট্রের সঠিক ধারণা সম্পর্কে অবহিত করার এবং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার দাবীর ব্যাপারে মতৈক্যে উপনীত করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলাম এবং শুভাকাংখী ও সহযোগীদের সংগঠিত করার যে কাজ শুরু করেছিলাম তার মধ্যে এই ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখিত তিনটি অংশের প্রতিই পূর্ণ মনোযোগ দেয়া হয়েছিল। অতপর আদর্শ প্রস্তাব পাশ হবার পর এর কার্যকারিতা ও দাবীসমূহ স্পষ্টভাবে জনগণকে বুঝিয়ে দেয়া, প্রথম শ্রেণীর লোকদের পক্ষ থেকে এর যে বিরোধিতা তার প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, তা কার্যকরী করার জন্যে ক্ষমতাসীনদেরকে বাধ্য করতে জনমত সৃষ্টি করা এবং সৎ নেতৃত্বের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনমনে আগ্রহ সৃষ্টি করা এসব কিছুই ছিল সেই ব্যবস্থাপত্র অনুসারে। এরপর নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত এবং তার বিশেষ কর্মপন্থাও এব্যবস্থাপত্রের কর্মসূচীর একটি অংশ ছিল এবং আছে। পাঁচ ছয় মাসের সংক্ষিপ্ত সময়ে শুধুমাত্র পাঞ্জাবের নির্বাচনী তৎপরতায় আমরা প্রায় পঁচিশ লাখ লোকের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়েছি। এদের মধ্যে গ্রামীন এবং নগরবাসী উভয় ধরনের লোকই শামিল ছিল। এদের মধ্যে প্রায় সোয়া দুই লক্ষ লোককে সর্বপ্রকার ভয়ভীতি, লোভ লালসা এবং ষড়যন্ত্র প্রতারণা সত্ত্বেও এই আহবানের পক্ষে সম্মত করা গেছে।

এদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রায় দুই হাজার নতুন লোককে সংশোধনের বাস্তব তৎপরতায় অংশগ্রহণের জন্যে আমাদের সংগী হিসেবে গ্রহণ করতে পেরেছি। এভাবেই এখন সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশের নির্বাচনকে আল্লাহ চাহে তো আমরা একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবো।

এ ছিল আমাদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা। এখন সেই চিকিৎসা কাজের জন্যে যে ব্যাপক ভিত্তিক কর্মসূচী আমরা গ্রহণ করেছি তা আমাদের সদ্য সমাপ্ত মজলিসে শূরার বৈঠকের কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত হয়েছে। এ কর্মসূচীর বৈশিষ্ট্য হলোঃ

এক. মুত্তাফিক (সহযোগী) সংগঠনের উদ্দেশ্য হলো, সংশোধনের কাজে দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের সহযোগিতা অধিকতর ব্যাপক এবং অধিকতর নিয়মতান্ত্রিকভাবে লাভ করা।

দুই. প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোর উদ্দেশ্য হলো, জামায়াতের রুকনদের সাথে সাথে সহযোগীদেরও মানসিক ও নৈতিক দিক থেকে এই মহান কার্য সম্পাদনের উপযুক্ত করে তৈরী করা।

তিন. মুত্তাফিক (সহযোগী) সংগঠনকে এখন কাজের যে প্রাথমিক কর্মসূচী দেয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য হলো, মুত্তাফিক পুরুষ ও নারীরা পর্যায়ক্রমে জন-সাধারণের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার জন্যে অগ্রসর হবে এবং তাদের ধর্মীয়, নৈতিক, শিক্ষাগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা পরিশুদ্ধ করার জন্যে প্রচেষ্টা শুরু করবে। সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ধীরে ধীরে এই কার্যপরিধিকে অধিকতর প্রশস্ত করার চেষ্টা করা হবে।

চার. শ্রমিক ও পেশাজীবিদের এজন্যে সংগঠিত করতে হবে, যাতে করে তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে সহযোগিতা দানের সাথে সাথে তাদের নৈতিক ও দীনি অবস্থাও পরিশুদ্ধ করা যায় এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের হাতিয়ারে পরিণত হওয়া থেকে তাদেরকে রক্ষা করা যায়।

তৃতীয় উদ্দেশ্য

আমাদের তৃতীয় উদ্দেশ্য হলো, "এই নতুন দেশটি যেন অনিবার্যভাবে সেইসব বুনিয়াদের উপর নির্মিত হয়, যা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে আদর্শ প্রস্তাবে এবং এমন কোনো প্রচেষ্টা যেন চলতে না পারে যা আদর্শ প্রস্তাবকে পদদলিত করে এখানে একটি অনৈসলামী ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।"

এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কাজটা যে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ তা সঠিকভাবে অনুমান করার জন্যে সর্বপ্রথম আদর্শ প্রস্তাবের প্রকৃত গুরুত্ব ও মূল্য ভালভাবে নির্ণয় করে নেয়া প্রয়োজন। এ প্রস্তাবের মাধ্যমে পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক অবস্থানের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা আসলে এর চাইতে বেশী কিছু নয় যে, এদেশ নীতিগতভাবে দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে। এই সামান্য পরিবর্তন, আমরা যা চাই তা সবই আমাদের দিয়ে দেয়নি। এখনো এক বিরাট কাজ বাকী রয়েছে। আর তা হলো, দেশটিকে কার্যত 'দারুল ইসলাম' বানানো। একটি উদাহরণের মাধ্যমে কথাটি বুঝুন। মনে করুন, আদর্শ প্রস্তার হচ্ছে নিছক একটি 'কালেমায়ে শাহাদাত' যা উচ্চারণ করে একজন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে। যদিও একাজটি একটি বিরাট কাজ এবং যথাস্থানে এর গুরুত্বকে উপেক্ষা করা যেতে পারেনা। কিন্তু শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহণ দ্বারাই সেইসব কিছু অর্জিত হয়না, ইসলাম প্রচারের যা উদ্দেশ্য। যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, ইসলাম কবুল করার পর তার চিন্তা পদ্ধতি এবং জীবন যাপন পদ্ধতিও ইসলামের কাংখিত নীতি অনুযায়ী পরিবর্তন হওয়া জরুরী। তাকে ফরজকে ফরজ মেনে তা আদায় করতে হবে। হারামকে হারাম বলে মানতে হবে এবং তা থেকে বাঁচতে হবে। আল্লাহ এবং রাসূলের (স) হুকুমকে আইনের ভিত্তি বলে স্বীকার করতে হবে এবং তার সম্মুখে মাথা নত করে দিতে হবে। আল্লাহর শরীয়ত নির্ধারিত সীমাসমূহ জানতে হবে এবং নিজের বাস্তব জীবনকে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। যতোক্ষণ না তার জীবনে এইসব পরিবর্তন সূচীত হবে। ততোক্ষণ পর্যন্ত তার অবস্থা ঐ নও মুসলিমের মতোই হবে, যে শুধুমাত্র কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে। ধ্যান ধারণা, চরিত্র ও আমলের দিক থেকে সেরকমই অমুসলিম থেকে গেছে, যেমন ছিল কালেমা পড়ার আগে। এরূপ অবস্থা একজন ব্যক্তির ব্যাপারেও গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। আর একটি ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তো গ্রহণযোগ্য হবার প্রশ্নই উঠেনা। একটি অলিখিত শাসনতন্ত্রের অধিকারী দেশে তো এসব পরিবর্তন পর্যায়ক্রমে 'ঐতিহ্যের' পরিবর্তনের মাধ্যমে হতে পারে। কিন্তু একটি লিখিত শাসনতন্ত্রের অধিকারী

দেশের জন্যে অবশ্যি তার শাসনতন্ত্রে সকল পরিবর্তনের কথা স্পষ্টভাবে লিখিত হতে হবে, যা তার 'কালেমা পড়ার' সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তার গোটা কাঠামো ও ব্যবস্থাতে চালু হবে। এছাড়া তার পূর্ব কর্মনীতি ও পদ্ধতিও পরিবর্তন হতে পারেনা আর তাকে ইসলামের ভিত্তিতে কোনো কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতির অনুসারীও বানানো যেতে পারেনা।

এগুলো হচ্ছে সেই সব কাজ, যা এখানে দারুল ইসলাম বানানোর ক্ষেত্রে বাকি রয়েছে। অপর দিকে ঐ পরিবেশ পরিস্থিতির দিকেও দৃষ্টি দিয়ে দেখুন, যেখানে এই বাকি কাজগুলো সম্পাদন করতে হবে। আমরা এই বাস্তব অবস্থাকে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারিনা যে, দেশে ইসলামের প্রতি অনুরাগী সাধারণ জনগণের সংখ্যা যতোই বেশী হোক না, ইসলামের যথার্থ জ্ঞান তাদের মধ্যে খুবই কম এবং ইসলামী রীতি নীতির বাস্তব প্রশিক্ষণের অভাব তার চাইতেও প্রকট। যারা আমাদের রাজনীতির লাগাম ধরে আছেন, তাদের গোটা মানসিকতা গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য পরিবেশে। যেসব কর্মচারী আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় কর্মরত রয়েছেন, আজ পর্যন্ত তারা যতোটুকু প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তার সবই পাশ্চাত্য ধাঁচের রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী। যে শিক্ষিত শ্রেণীর চেতনাবোধ, ইচ্ছা আকাংখা এবং কর্তব্য পরায়ণতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় আমাদের জাতীয় জীবন, তারাই চরম দুঃখজনক চিন্তা ও মানসিক নৈরাজ্যে নিমজ্জিত। আর যদি সামান্য ইসলামী বোধ তাদের মধ্যে পয়দা হয়েও থাকে, তবে ইচ্ছা শক্তির দুর্বলতা এবং কর্তব্যের অবহেলা সেটাকে একেবারেই প্রভাবহীন করে দিয়েছে। যে সাধারণ জনগণের ভোট একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্তকরী শক্তি হয়ে থাকে, আমাদের দেশে তারা এখনো ইসলামী এবং অনৈসলামী শাসনতন্ত্রের পার্থক্য বুঝবার উপযুক্ত নয়। তাছাড়া তাদের মধ্যে এখনো এতোটা শক্তিশালী ও সুসংগঠিত সাধারণ মত সৃষ্টি হয়নি যদ্বারা রাষ্ট্রীয় গাড়ীকে ভুল পথে যেতে দেখলে তা রুখতে পারে এবং সঠিক গন্তব্য পথের দিকে মোড় ঘুরাতে বাধ্য করতে পারে। এমতাবস্থায় এই 'নীতিগত দারুল ইসলাম'কে 'বাস্তবের দারুল ইসলাম' বানানোর যে মহান কাজ এখনো বাকি রয়েছে, তা তার চাইতেও কঠিন মনে হয়, যতোটা কঠিন অনুভব হয় প্রথম নযরে। এই শক্ত কাজটিও সহজ হতো, যদি ক্ষমতাসীনরা কেবল ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার রোগে আক্রান্ত হতো, তা থেকে পলায়নী মনোবৃত্তির রোগে আক্রান্ত না হতো। এমতাবস্থায় বড় মাথা ব্যাথার কারণ একটিই থাকতে পারতো, আর তা কেবল পশ্চিমা দর্শন ও দৃষ্টিভংগি এবং পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহের দৃষ্টান্ত থেকে তাদের আসক্তি কিভাবে দূর করা যায়, ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক স্বাতন্ত্র্য কিভাবে তাদের মন মানসিকতায় গেঁথে

সেসব কারিগরদের হাতে কেমন করে একটি নতুন অট্টালিকা বানানো যায় যারা এধরনের নির্মান কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ? সমস্যা যদি এটুকুই হতো, তবে তা দূর করার জন্যে ধুসর মরু পাড়ি দেবার প্রয়োজন পড়তো না। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এর চাইতেও কঠিনতর। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে এই লোকগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা ও রূপরেখা সম্পর্কে যে ঘাপলা করেছিল তা আমরা ভুলে যেতে পারিনা। একথাও আমরা ভুলতে পারিনা যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইসলামী রাষ্ট্র প্রশ্নে এরা উনিশটি মাস যাবত অবিরামভাবে কিরূপ টাল বাহানা করেছিল এবং তা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে কি কি ধরনের প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিল। আদর্শ প্রস্তাবের তিক্ত টেবলেট এরা কতোটা অরুচীর সাথে গ'লধকরণ করেছে তাও আমরা ভুলতে পারিনা। আমরা একথাও ভুলে যেতে পারিনা যে, আদর্শ প্রস্তাব পাশ হবার পর বিগত ত্রিশ মাসে তারা তাদের সরকারের নীতি পদ্ধতিতে এমন কোনো নামকাওয়াস্তে পরিবর্তনও করেনি, যা দ্বারা একথা প্রমাণ করা যেতো যে, আদর্শ প্রস্তাব তারা সৎ উদ্দেশ্যেই পাশ করেছিল। তাছাড়া ঐসব শাসনতান্ত্রিক সুপারিশমালা তো আমরা কেবল গত বছরই দেখতে পেয়েছি, যেগুলো দীর্ঘ দিনের অনুসন্ধানের পর তারা প্রণয়ন করেছে এবং যেগুলোতে তারা নিজেদের আসল স্বরূপ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিয়ে একটি নিরেট অনৈসলামী শাসনতন্ত্রের খসড়া নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। একথাগুলো সামনে রাখলে বুঝা যায়, এখন আমাদের সামনে যে ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে, তা আদর্শ প্রস্তাব মঞ্জুর হবার পূর্বেকার অবস্থার চাইতেও অধিকতর মারাত্মক।

এমতাবস্থায় এ উদ্দেশ্যটি হাসিল করার জন্যে আমরা নিম্নরূপ কর্মসূচী নিয়েছিঃ

একদিকে ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি ও শাসনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে আরো অধিক স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে তোলার অবিরাম চেষ্টা জারি রাখা হবে, যাতে করে শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের মানসিক জটিলতাও দূর হয় এবং আইন সভার সদস্যদের মধ্যে যারা এ বিষয়ে সৎ উদ্দেশ্যে নির্দেশনা লাভ করতে চান তারাও তা লাভ করতে পারেন। এ উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের পূর্ব সাহিত্যগুলোর সাথে 'ইসলামী রিয়াসাত' শিরোনামে আরো একটি ধারাবহিক রচনা সংযোজন করি, যার নিম্নোক্ত চারটি অংশ এযাবত পুস্তিকাকারে প্রকাশ হয়েছেঃ

১. শহরিয়ত কে হুকূক ও ফারায়েজ (নাগরিকত্বের অধিকার ও কর্তব্য)
২. গয়রে মুসলিমূঁ কে হুকূক (অসুসলিমদের অধিকার)।
৩. কারকুন কী জিম্মাদারিয়াঁ (কর্মীদের দায়িত্ব)।
৪. ইতায়াত কে শারায়েত ও হুদূদ (আনুগত্যের শর্ত ও সীমা)।

অপরদিকে জনসাধারণকে ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা, আদর্শ প্রস্তাবের অর্থ, উদ্দেশ্য ও দাবী এবং সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যাপারে ক্ষমতাসীনদের দুর্বলতা ও সংকীর্ণতা সম্পর্কে অবিরামভাবে অবহিত করে যেতে হবে, যাতে করে জনগণ এবিষয়ে অধিক হারে সজাগ ও প্রস্তুত হয় এবং আদর্শ প্রস্তাবকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা কিংবা ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত করা কারো পক্ষে সহজ না হয়। ১৯৪৯ সালের পর থেকে একাজ অনবরত চলছে এবং ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে। অবশ্য কাজটি করার ক্ষেত্রে হিকমত ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগানো হচ্ছে, যাতে করে একটি কথা অবিরত বলার ফলে লোকেরা বিরক্ত হয়ে না পড়ে এবং এর প্রতি আকৃষ্ট হবার পরিবর্তে এর দ্বারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে না পড়ে।

অপরদিকে আদর্শ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ও দাবীর বিপরীতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যে উদ্যত ক্ষমতাসীনদের প্রতিটি পদক্ষেপকে কঠোরভাবে বাধা দেয়ার কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। গত বছর মৌলিক অধিকার এবং মৌলিক নীতি সংক্রান্ত আইনসভা কর্তৃক নিয়োগকৃত কমিটিসমূহ যে সুপারিশমালা পেশ করেছে সেগুলো প্রকাশ হবার সাথে সাথেই সেগুলোর তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। আল্লাহর অনুগ্রহে দেশের সকল ইসলাম প্রিয় লোকেরা সকল প্রকার দলীয় ও উপদলীয় বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে পূর্ণ একতা ও ঐক্যবদ্ধতার সাথে ক্ষমতাসীনদের এই পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ করেছে। ক্ষমতাসীনদের জন্যে এটা ছিল একটা উচিত শিক্ষা। আমরা আশা করি ভবিষ্যতেও যদি তারা এ ধরনের ভুল করে, তবে এরূপ শিক্ষাই তাদের দেয়া হবে। যদিও তারা মাঝে মধ্যে কোনো না কোনো ফিতনা সৃষ্টিকারী কথা রটিয়ে দিয়ে জনগণের দৃষ্টি দেশের মৌলিক সমস্যা থেকে বিচ্যুত করে কোনো অভ্যন্তরীণ কিংবা বাইরের ঘটনার প্রতি কেন্দ্রীভূত করে দেয় এবং তা থেকে তারা লাভবান হয়ে সাময়িকভাবে নিজেদের কিছুটা প্রভাব ফেলার চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহ্র সাহায্যে আমরা এই আশা রাখি যে, এধরনের কোনো চেষ্টা তাদেরকে নিজেদের মনগড়া শাসনতন্ত্র দেশের উপর চাপিয়ে দেবার কোনো সুযোগ এনে দেবে না।

চতুর্থ উদ্দেশ্য

আমাদের কর্মসূচীর চতুর্থ এবং সর্বশেষ মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, "শাসনতান্ত্রিক উপায়ে যেন দেশের বর্তমান নেতৃত্বকে একটি সৎ নেতৃত্বে পরিণত করা যায় এবং এই শাসনতন্ত্রকে কার্যকর করে আইন কানুন, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, অর্থসম্পদ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, জনকল্যাণ, প্রতিরক্ষা এবং

পররাষ্ট্রনীতিতে এমন সব সংশোধন করা যায় যাতে করে পাকিস্তান বিশ্বের বুকে ইসলামলের সঠিক প্রতিনিধিত্বশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়।"

এর জন্যে আমরা যে উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচী গ্রহণ করেছি তা বুঝার জন্যে কয়েকটি ভূমিকা মনে গেঁথে নেয়া জরুরীঃ

১. আমাদের সামষ্টিক উদ্দেশ্য মুসলমান হিসেবে এছাড়া আর কিছুই হতে পারেনা যে, একদিকে আমরা স্বয়ং সেইসব আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং বস্তুগত বরকতসমূহ ভোগ করবো, যা ইসলাম আমাদের দিয়েছে। অপর দিকে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে ইসলামী ন্যায়বিচার, ইসলামী নৈতিকতা এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এমন প্রকাশ ঘটাবো, যাতে করে ইসলাম যে সত্য জীবন ব্যবস্থা, গোটা বিশ্বের সামনে সেই সাক্ষ্য প্রদানের দায়িত্ব সম্পন্ন হয় এবং সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, যার জন্যে আমাদেরকে একটি উম্মাহ বানানো হয়েছে ঃ

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُم أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيكُم شَهِيدًا–

২. এই উদ্দেশ্য কেবল তখনি বাস্তবায়িত হতে পারে, যখন আমাদের সামজিক ও সামষ্টিক বিষয়সমূহের বাগডোর এমন সব লোকদের হাতে অর্পিত হবে, যারা রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার যোগ্যতার অধিকারী হবার সাথে সাথে ইসলামী মন মানসিকতা ও ইসলামী নৈতিক চরিত্রেরও অধিকারী হবে। তাছাড়া আধুনিক কালের একটি উন্নত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ইসলামের মূলনীতি অনুযায়ী পরিচালনারও পূর্ণ যোগ্যতা তাদের মধ্যে থাকবে।

৩. বর্তমান নেতাদের অতি বড় কোনো কর্তারও এদাবী করার সাহস নেই যে, তিনি এইসবগুলো গুণে গুণান্বিত। বরঞ্চ দৃষ্টিবান লোকেরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন, তাদের মধ্যে যেসব গুণাবলী বর্তমান, তা সবই এই কাংখিত গুণাবলীর সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং এই নেতৃত্বকে একটি সৎ নেতৃত্বে পরিবর্তন করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

৪. দেশের সরকার যদি বিশেষ কোনো বংশ, শ্রেণী বিংবা গোষ্ঠীর লীজে পরিণত হয়ে থাকে এবং তাদের পরিবর্তন করার জন্যে কোনো শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বর্তমান না থেকে থাকে, তবে তো সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা করা অপরিহার্য। কিন্তু দেশে যদি একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকে এবং সেই ব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসকদের পরিবর্তন করার কিছুমাত্র সুযোগ থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে সঠিক পথ এটাই যে, জনগণকে ফাসিক নেতৃত্ব ও সৎ নেতৃত্বের পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। তাদের মধ্যে সৎ নেতৃত্বের

দাবী ও প্রেরণা জাগ্রত করে তুলতে হবে। ইসলামী রূপরেখা অনুযায়ী দেশ পরিচালনার একটি পরিষ্কার কর্মসূচী তাদের সামনে পেশ করতে হবে এবং ক্রমান্বয়ে তাদেরকে এতোটা যোগ্য করে তুলতে হবে, যাতে করে তারা এমন সব সৎ লোকদের বাছাই করে নিতে পারে, যারা এ কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার মতো যোগ্যতার অধিকারী হবে।

৫. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিকৃতির সংস্কার কেবল কথার মাধ্যমে হয়ে যায়না। বরঞ্চ এজন্যে বছরের পর বছর ধরে সুসংগঠিত চেষ্টা সাধনা এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলা সংগ্রামের প্রয়োজন হয়। সহজ কথা হলো, যেখানে জনগণের ভোটে শাসক নির্বাচিত হয় সেখানে যদি বিকৃতি পাওয়া যায়, তবে সে বিকৃতির উৎস কেবল চারটি জিনিসই হয়ে থাকেঃ

এক. জনগণের অসচেতনতা ও নৈতিক অধঃপতন।

দুই. এমন একটি প্রভাবশালী শ্রেণীর অস্তিত্ব, যারা জনগণের এই দুর্বলতাগুলোর সুযোগে অবৈধ ফায়দা হাসিল করে ক্ষমতার মসনদ কব্জা করে নেয়। সেই সাথে সমাজে এমন কিছু সুবিধাবাদী শ্রেণীর অস্তিত্ব, যারা এই দুষ্কর্মের পতাকাবাহীদের সহযোগী ও সাহায্যকারী হয়ে বসে।

তিন. আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব এমনসব বিবেকহীন ও দায়িত্বহীন লোকদের হাতে ন্যস্ত হওয়া যারা নিজেরাই আইনের সীমা লংঘন করে নির্বাচনে বিকৃতির পতাকাবাহীদের সাহায্য করে।

চার. নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এমনসব মৌলিক ভ্রান্তির বর্তমান থাকা, যেগুলোর কারণে সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া সম্ভব হয়না।

বিকৃতির এই চারটি কারণকে যদি কোনো ব্যক্তি ভালভাবে অনুধাবন করতে পারেন, তবে এব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ থাকবেনা যে, এই কারণগুলো যতোদিন বর্তমান থাকবে তোদিন কিছুতেই ফাসিক ফাজিরদের কব্জা থেকে মুক্ত হওয়া যেতে পারেনা এবং একটি সৎ ব্যবস্থা কিছুতেই প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারেনা। সেই ব্যক্তির এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ থাকবেনা যে, নির্বাচন থেকে সম্পর্কহীন থেকে শুধুমাত্র প্রচার, প্রশিক্ষণ ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সত্য জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারেনা। এব্যাপারেও তার কোনো সংশয় থাকবেনা যে, সংস্কার কাজ যখনই করা হোক না কেন, তা এভাবেই করতে হবে। অর্থাৎ নির্বাচনে অংশ নিতে হবে এবং অবিরামভাবে সুসংগঠিত ও হিকমতপূর্ণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেইসব বিকৃতির শিকড় কেটে দিতে হবে। যাতে করে জনগণ সঠিক পন্থায় সঠিক উদ্দেশ্যের জন্যে যথাযোগ্য

ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার যোগ্যতা অর্জন করে। কেবল এ পন্থায়ই এখানে ইসলাম ক্ষমতায় আসতে পারে।

গত বছর থেকে আমরা একাজই আরম্ভ করেছি। নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কারের জন্যে আমরা যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছি তা "জামায়াতে ইসলামী কী এন্তেখাবী জিদ্দ ও জিহাদ" পুস্তিকায় সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগে আমরা যে সংস্কার সংশোধন চাই আমাদের 'ইশতেহারে' তার বিস্তারিত রূপরেখা আমরা পেশ করেছি। এখন যেহেতু শুধুমাত্র প্রদেশসমূহে নির্বাচন হচ্ছে, সেজন্যে এখন আমরা কেবল এতোটুকু বলেছি যে, পঁয়ত্রিশ সালের এ্যাক্টের অধীনে একটি প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ইসলামের দাবী অনুযায়ী জীবনের কাঠামোতে কি কি সংশোধন আনা যেতে পারে? পরে যদি কখনো কেন্দ্রীয় নির্বাচনের সুযোগ আসে, গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামের ছাঁচে ঢেলে সাজাবার পন্থা তখনই আমরা বিস্তারিতভাবে বলবো, ইনশাল্লাহ্।[২০] এ দুটি জিনিস নিয়ে আমরা এখন জনগণকে প্রশিক্ষণ ও সংগঠনের বাস্তব কাজ করে যাচ্ছি। আর প্রথমেই নির্বাচনী তৎপরতার যে ফলাফল আমরা লাভ করেছি সেটা আমাদের একান্ন সালের ৫-৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত মজলিশে শূরার কার্যবিবরণীতে প্রকাশ হয়েছে।[২১] আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এ পন্থায় যদি অনবরত কাজ চালিয়ে যাওয়া যায় তবে ধীরে ধীরে জনগণের অসচেতনতা এবং নৈতিক ত্রুটিসমূহ দূর হয়ে যাবে। এসব দুর্বলতা থেকে যারা অবৈধ স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করেন, সেই গোষ্ঠীর শক্তিও বিলীন হয়ে যাবে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনার কাজে নিয়োজিত সর্বপর্যায়ে যে পরিমাণ বিবেকবান ও দায়িত্ববান লোক বর্তমান রয়েছে তাদের সহানুভূতিও এই ঈমানদার লোকদের প্রচেষ্টার সাথে শামিল হতে থাকবে। তাদের সাহায্যে এবং জনমতের সহযোগিতায় অবশেষে বিশ্বাসঘাতকদের পথও রুদ্ধ করা যাবে, নির্বাচনের সময় যারা ফাসিকদের বিজয়ের হাতিয়ারে পরিণত হয়। এরপরেই নেতৃত্বের বাগডোর সেইসব সৎ লোকদের হাতে আসার সুযোগ সৃষ্টি হবে, যারা ইসলামকে তার স্বরূপে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে চান।

আল্লাহর বান্দাদের যদি চোখ থাকে এবং তা দিয়ে যদি তারা দেখতে চান, তবে দেখতে পারেন, আমাদের এই শেষ পদক্ষেপ গোমরা ও ফাসিকী ব্যবস্থার দুর্গের দিকে প্রত্যক্ষ অগ্রযাত্রা এবং এটা এমন একটা সিদ্ধান্তকরী আঘাত যা সরাসরি সেই দুর্গের প্রাচীরে গিয়ে পড়ছে। আমরা যদি আমাদের উদ্দেশ্যসমূহের

২০. ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহারে এসব কথা বলে দেয়া হয়েছে।
২১. বিস্তারিত বিবরণের জন্যে পরিশিষ্ট দেখুন।

মধ্যে শুধুমাত্র প্রথম তিনটি উদ্দেশ্যের জন্যে কাজ করি, কিংবা চতুর্থ উদ্দেশ্যটিকেও আমাদের কর্মসূচীতে গ্রহণ করি, কিন্তু তা হাসিল করার জন্যে বাস্তবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করি, তবে ফাসিক নেতৃত্ব কখনো দূর হবেনা আর সেই সৎ নেতৃত্বও কখনো প্রতিষ্ঠিত হবেনা, যার প্রতিষ্ঠার উপর ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা নির্ভরশীল। এই বাস্তব বিপ্লব যদি সংঘটিত হতে পারে, তবে এই শেষ পদক্ষেপ দ্বারাই হতে পারে যা আমরা এখন গ্রহণ করেছি। একারণেই যতোদিন আমরা এই পদক্ষেপ গ্রহণ করিনি, ততোদিন কোনো না কোনোভাবে আমাদেরকে সহ্য করা হয়েছিল। কিন্তু যখনই আমরা এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি তখুনি ফাসিক নেতৃত্ব এবং তাদের দোসররা ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে উঠেছে। পাকিস্তান থেকে নিয়ে হিন্দুস্থান পর্যন্ত বিপদ ঘন্টা বেজে উঠেছে। এই বিপদ দেখে পুরানো পুরানো শত্রুরাও ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে, যারা কখনো একত্র হতে পারতনা। দেওবন্দী এবং ব্রেলবীরা হাতে হাত মিলিয়েছে। পীর এবং ওহাবী (!) এক হয়ে গেছে। আহলে হাদীস এবং হাদীস অস্বীকারকারীরা গলায় গলা মিলিয়েছে। কাদিয়ানী এবং আহরার গোষ্ঠী কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে। আমাদের দশ বারো বছরের পুরোনো লেখা থেকে এরা সবাই গোমরাহীর নির্যাস বের করা শুরু করে দিয়েছে, যা পূর্বে কখনো তাদের নযরে পড়েনি, কিংবা দীনের জন্যে বিপজ্জনক মনে করেনি। ভারতের কংগ্রেসী আলেমরা পর্যন্ত ধর্মীয় জযবার দাবীতে বাধ্য হয়ে নিজেদের দারুল ইফতাসমূহের গোলা বারুদ দিয়ে পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাহায্য করছে। এমনকি মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেবের জামায়াতেরও কোনো কোনো মাশায়েখ প্রথমবারের মতো এবারই পূর্ণ খোদা ভীতি ও বিনয়ের সাথে জামায়াতে ইসলামীর সেইসব ত্রুটির পরিসংখ্যাণ প্রকাশ করেন যা তাদের পবিত্র চিন্তায় ছিল! এসব কিছু দেখেও যদি আমরা সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছি বলে লোকদের আস্থা না জন্মায়, জানিনা তবে আর কোন্ সব নিদর্শনের ভিত্তিতে তারা সত্যের পরিচয় লাভ করবেন? এই গণচাঞ্চল্যের মধ্যে শয়তানের সেই ভীতির নিদর্শনই আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যা ইসলামকে তার চূড়ান্ত মঞ্জিলের কাছাকাছি পৌঁছুতে দেখে তার মধ্যে সঞ্চার হয়েছে।[২২]

---

২২. আমাদের ভবিষ্যত কর্মসূচী সবিস্তারে বুঝবার জন্যে 'ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী' গ্রন্থটি পড়ুন।

পরিশিষ্ট

৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখকৃত মজলিশে শূরার কার্যবিবরণী থেকে

মজলিশে শূরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, বর্তমন নির্বাচনী আইন ও নির্বাচন পদ্ধতির সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও পাঞ্জাবের বিগত নির্বাচনসমূহে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পাওয়া বিশেষ এবং নির্বিশেষ সকল শ্রেণীর মানুষের যাবতীয় নৈতিক দুর্বলতা সত্ত্বেও, সরকার কর্তৃক তৈরী করা নিয়ম কানুনের বিপরীত স্বয়ং সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নির্বাচনে যাবতীয় অবৈধ হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও, যা পাঞ্জাবের বিগত নির্বাচনসমূহে খোলাখুলিভাবে তারা করেছে এবং ভবিষ্যতে একটা দীর্ঘ সময় ধরে পাকিস্তানের যে কোনো নির্বাচনে করার আশংকা রয়েছে, ঐ সকল নীতি বিবর্জিত ও নিয়ম শৃংখলা ভংগকারী কার্যক্রম সত্ত্বেও যা প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ নির্বাচনসমূহে আনায়াসে ও লাগামহীনভাবে করে থাকে, অতীতে করেছে এবং ভবিষ্যতে করবে বলে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে এবং জামায়াতে ইসলামীর কাছে উপায় উপকরণ ও কর্মঠ লোকের ব্যাপক কমতি থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত দেশে শাসনতান্ত্রিক উপায়ে সংশোধন আনার ব্যাপারে নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই।

জামায়াতে ইসলামী নিম্নোক্ত নির্ভেজাল তথ্যাবলীর ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেঃ

পাঞ্জাবের বিগত নির্বাচনসমূহে অত্যন্ত সীমিত উপায় উপকরণ নিয়ে মাত্র পাঁচ মাসের নির্বাচনী তৎপরতায় জামায়াতে ইসলামী যে ফল লাভ করেছে তা নিম্নরূপঃ

এক. পাঞ্জাবের সাঁইত্রিশটি নির্বাচনী এলাকায় এমন প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক পাওয়া গেছে, যারা আমাদের নির্বাচনী পলিসিকে সঠিক মনে করে 'ভোটারের শপথ নামায়' দস্তখত করেছেন।

দুই. এসব এলাকায় ১৩৯০টি এমন গ্রাম পাওয়া গেছে যারা সৎ প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্যে স্থানীয় পঞ্চায়েত গঠন করেছে।

তিন. এই এলাগুলোতে যে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে তাতে ২,১১৯ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন এবং নিজেদের সাধ্যানুযায়ী অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে এমন তিপ্পান্ন জন লোককে নিজেদের এলাকাসমূহের প্রতিনিধিত্বের জন্যে বাছাই করেন যারা ছিলেন জ্ঞান ও নৈতিক চরিত্রের দিক

থেকে অন্যসব দলের প্রার্থী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর। তাছাড়া এদের চরিত্র সম্পর্কে তাদের বিরোধীরা পর্যন্ত কোনো আপত্তি তুলতে সক্ষম হয়নি।

চার. এই নির্বাচনী তৎপরতা চলাকালে সাধারণ জনগণের থেকে এমন সতের শ' নতুন ব্যক্তি এগিয়ে এসেছেন যারা কোনো প্রকার লোভ লালসা এবং ব্যক্তি স্বার্থ ছাড়াই আমাদের কর্মীদের পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন, আমাদের কর্মীদের জন্যে আরোপিত সকল নৈতিক বিধিনিষেধ অনুসরণ করেছেন এবং জীবন বাজী রেখে কাজ করেছেন।

পাঁচ. পাঞ্জাবের এই বিরাট এলাকায় জামায়াতের মাত্র তিন চার হাজার কর্মী যে ব্যাপক নির্বাচনী তৎপরতা চালিয়েছে এবং তাতে তাদেরকে জামায়াত বিরোধী দল ও প্রার্থীদের যে চরম অনৈতিক ও উশৃংখল কার্যক্রমের মোকাবেলা করতে হয়েছে, তা সত্ত্বেও চরম নির্বাচনী উত্তেজনার সময়ে পর্যন্ত জামায়াত কর্মীরা সামগ্রিকভাবে নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা এবং নিয়মশৃংখলা অনুসরণে এমন অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, সরকারী কর্মচারী এবং জামায়াত বিরোধী দলসমূহের কর্মীদের পর্যন্ত যার স্বীকৃতি দিতে হয়েছে। গোটা নির্বাচনী কার্যক্রমের পর্যালোচনার মাধ্যমে জানা গেছে যে, মাত্র দুচারটি নির্বাচনী এলাকা ছাড়া গোটা পাঞ্জাবের কোথাও জামায়াত কর্মীদের দ্বারা কোনো নৈতিক ক্রটি কিংবা আইন শৃংখলা বিরোধী কার্যক্রম সংঘটিত হয়নি। আর সেই দুতিনটি এলাকায়ও সমষ্টিগতভাবে জামায়াত কর্মীদের দ্বারা এসব ক্রটি সংঘটিত হয়নি বরঞ্চ ব্যক্তিগত পর্যায়ে কয়েকজন কর্মীর দ্বারা তা সংঘটিত হয়েছে, যাদের বেশীরভাগই নতুন কর্মী।

ছয়. গোটা পাঞ্জাবের নির্বাচনী তৎপরতায় জামায়াত এবং পঞ্চায়েতগুলোর সর্বসাকুল্য ব্যয় হয়েছে এক লাখ সাতাশ হাজার টাকা। এই ব্যয় দ্বারা সেই সব লোকদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে, যারা কোনো কোনো স্থানে এক একটি সীটেই প্রায় এই পরিমান টাকা খরচ করেছে।

সাত. পাঞ্জাবের এই নির্বাচনে সরকারী দমন পীড়ন, জমিদারদের দলন পেষণ, জাতি ও গোষ্ঠীগত আঁতাত, টাকার লোভ দেখিয়ে ভোট লাভের ব্যাপক ও আবাধ তৎপরতা এবং সর্বপ্রকার কুটকৌশল ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়া সত্ত্বেও জামায়াতের আহবানে পঞ্চায়েতসমূহের প্রতিনিধিদেরকে দুই লক্ষ সতের হাজার আট শত উনষাট ব্যক্তি ভোট দিয়েছেন। (এসংখ্যা ভোটারদের সংখ্যা, ভোটের সংখ্যা নয়। কারণ অধিকাংশ স্থানে এক একজন ভোটারকে দুই দুইজন ব্যক্তির পক্ষে নিজের ভোট প্রয়োগ করতে হয়েছে।) এরা কোথাও ধোঁকা, প্রতারণা জালভোটের আশ্রয় গ্রহণ করেনি। অবশ্য কোনো কোনো স্থানে হয়তো বা

পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদেরকে তাদের গোষ্ঠীর লোকেরা গোষ্ঠীগত ভ্রাতৃত্বের চেতনায় ভোট দিয়েছে। আমরা যদি একটু বাড়িয়ে এধরনের ভোটারের সংখ্যা উপরোক্ত সংখ্যার এক চতুর্থাংশও ধরে নিই, তার পরও আমরা বলতে পারি, পাঞ্জাবের নির্বাচনী এলাকাগুলোতে কমপক্ষে একলাখ ষাট হাজার লোক আমাদের আহ্বান গ্রহণ করেছে, যারা সকল প্রকার হুমকী ধমকী ও লোভ লালসা উপেক্ষা করে নিরেট আদর্শিক কারণে তাদের ভোট এদিকে প্রয়োগ করেছে।

আট. বিশেষভাবে আমাদের জন্যে সান্ত্বনার বিষয় হলো, এই নির্বাচনী তৎপরতায় যেসব মহিলা পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের পক্ষে কাজ করেছেন, তারা পূর্ণ শরয়ী পর্দার সীমা রক্ষা করেছেন। পক্ষান্তরে দুই একটি পুলিং ষ্টেশন ছাড়া গোটা পাঞ্জাবে কোনো নির্বাচনী কেন্দ্র এমন ছিলনা, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মহিলা ভোটাররা পর্দার সীমা রক্ষা করেছে।

এমন একটি পরিবেশ পরিস্থিতিতে আমরা এই ফল লাভ করেছি, যখনঃ

১. নির্বাচনী তৎপরতার সূচনাতেই জামায়াতকে গণমাধ্যম থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। জামায়াতের দৈনিক পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

২. গোটা গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থাসমূহ জামায়াতকে বাস্তবে বয়কোট করেছে এবং অধিকাংশ প্রেসই ছিল জামায়াতের কঠোর বিরোধী

৩. পত্র পত্রিকায় ইশতেহার, বিজ্ঞাপন এবং বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে জামায়াতের বিরুদ্ধে মহোদ্যমে চরম ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছাড়ানো হয়েছে। বিশেষভাবে মৌলবী সাহেবান ও পীরদের মাধ্যমে ধর্মীয় শংসয় ছড়ানোর তুফান সৃষ্টি করা হয়েছে।

৪. জামায়াত কর্মীরা এবারই প্রথম বারের মতো নির্বাচনী কাজে অংশ গ্রহণ করে। অধিকাংশেরই নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিলনা। নৈতিক বন্ধন এবং আইন শৃংখলার পূর্ণ অনুসরণ করে নির্বাচনী ময়দানে অবতীর্ণ হবার আধুনিক গণতন্ত্রের ইতিহাসে এটাই সম্ভবত তাদের প্রথম অভিজ্ঞতা।

এসব কারণে উপরে উল্লেখিত ফলাফল দৃষ্টে মজলিশে শূরা মনে করে, আমাদের জন্যে নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই। আমরা যদি জনমতকে প্রশিক্ষিত করার, কর্মীদেরকে মান অনুযায়ী তৈরী করার এবং দেশবাসীর নৈতিক সংশোধনের জন্যে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাই, তবে শেষ পর্যন্ত এখানে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় শান্তিপূর্ণ ইসলামী বিপ্লব ঘটানোর পূর্ণ আশা করা যায়। সুতরাং নির্বাচন সম্পর্কে জামায়াতের পলিসি পূর্বের মতোই জারি থাকা উচিত

এবং দেশের যেখানেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তাতে অংশ গ্রহণের চেষ্টা করা উচিত।

নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার প্রসংগ

সদ্য সমাপ্ত পাঞ্জাবের নির্বাচনী অভিজ্ঞতায় একথা তীব্রভাবে অনুভব করা হয় যে, একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনের স্বাধীনতা ও সুস্থতা মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী জনমতের স্বাধীনতার সাথে বিবেকের সাক্ষ্য অনুযায়ী ভোট প্রয়োগ করার মধ্যেই জাতীয় জীবনের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। রাষ্ট্র ক্ষমতার জোরে যদি নির্বাচনে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা হয়, কিংবা প্রভাবশালী লোকেরা নিজেদের শক্তিবলে জনগণের উপর চাপ প্রয়োগ করে ভোট লাভ করে, কিংবা অর্থশালীরা টাকা দিয়ে ভোট ক্রয় করে, অথবা যদি অবৈধ পন্থায় জনমতকে প্রতারিত করার চেষ্টা করা হয়, কিম্বা ভোট গণনায় ধোঁকাবাজির আশ্রয় নেয়া হয়, তবে এর পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। এতে কেবল রাষ্ট্র ব্যবস্থাই বিকৃত হবেনা, বরঞ্চ এর ফলে জনগণ নিয়মতান্ত্রিক উপায় থেকে নিরাশ হয়ে বে-আইনী পন্থার দিকে অগ্রসর হবে এবং গোটা জাতীয় জীবনের গতি শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে সন্ত্রাস, ডিক্টেটরশীপ এবং রক্তাক্ত বিপ্লবের দিকে মোড় নিবে। একারণে মজলিশে শূরা নির্বাচনের সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত সকল শ্রেণীর লোকদের কাছে, তারা ক্ষমতাসীন কর্তৃত্বের অধিকারী হোন, কিংবা রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মী হোন, অথবা স্বতন্ত্র প্রার্থী হোন, এই আবেদন করছে যে, তারা যেন নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থে কিংবা দলীয় স্বার্থে দেশকে এতো বড় ক্ষতি ও বিপদে নিমজ্জিত না করেন এবং নির্বাচনকে যাবতীয় ধোঁকা প্রতারণা এবং অন্যায় দুষ্কৃতি থেকে পবিত্র রাখার চেষ্টা করেন। এ প্রসংগে মজলিশে শূরার রায় হলো, সকল নির্বাচনের সময় জামায়াত কর্মীদেরকে বিশেষভাবে এই সকল অবৈধ উপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারের কাজ করতে হবে। এই সব অপরাধের ক্ষতি ও অশুভ পরিণতি সম্পর্কে বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জনগণকে অবহিত করতে হবে। জনগণের মন মগজে একথা বদ্ধমূল করে দিতে হবে যে, এই সকল অবৈধ উপায় অবলম্বন করার চাইতে দেশের সাথে বড় কোনো গাদ্দারী হতে পারে না।

—— o ——